বিজ্ঞানের ১০০ মজার পরীক্ষা

আরিফুজ্জামান

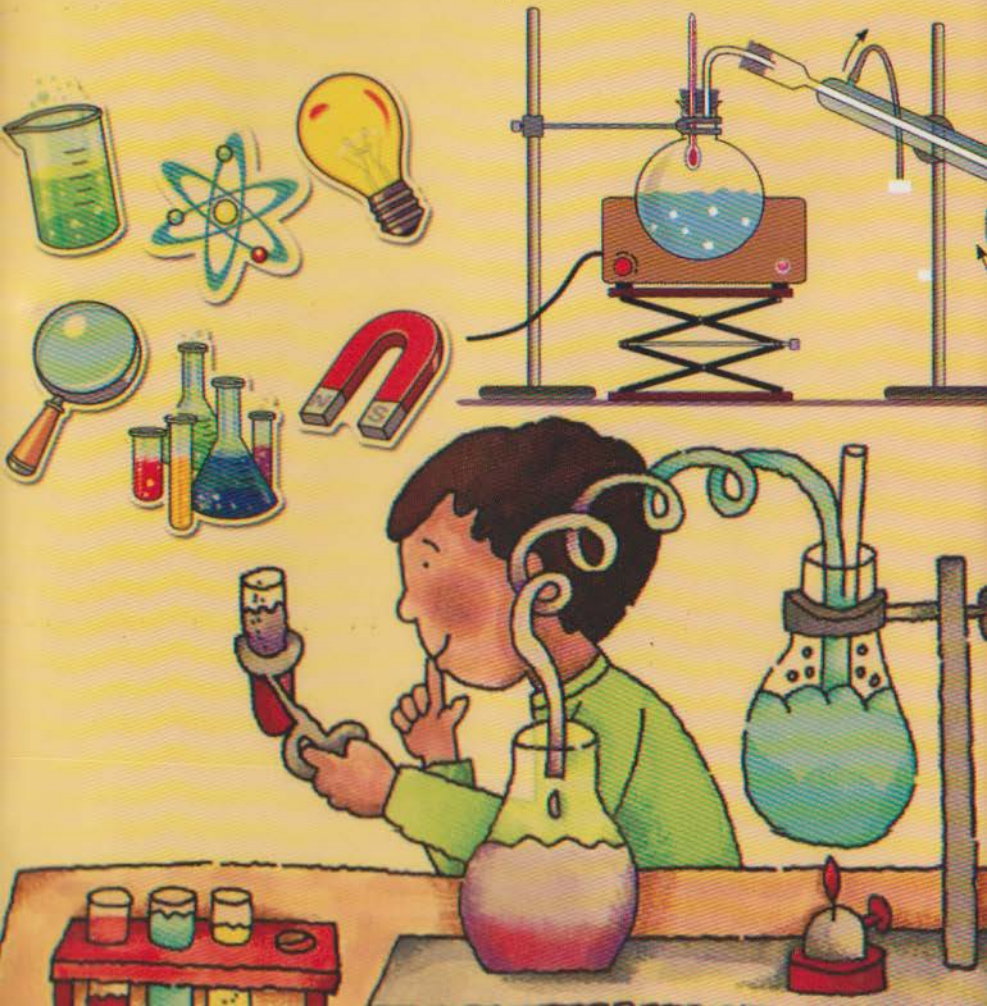

বিজ্ঞানের ১০০ মজার পরীক্ষা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের ১০০ মজার পরীক্ষা

আরিফুজ্জামান

সৃজনী

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের ১০০ মজার পরীক্ষা
আরিফুজ্জামান

প্রকাশনায়

সৃজনী
৪০/৪১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৭৫০৭১

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০১৭

©
লেখক

প্রচ্ছদ
মশিউর রহমান

মুদ্রণ
ঢাকা প্রিন্টার্স, ঢাকা

দাম : ১৬০ টাকা

ISBN : 978-984-8383-170-1

BIGGYANNER 100 MOJAR PORIKKHA by Arifuzzaman
Published by Srizoni, 40/41 Banglabazar, Dhaka-1100
Date of Publication : February 2017, Price : Tk. 160 Only. US$: 6
e-mail : srizoni2000@yahoo.com

USA Distributor : Muktodhara, Jackson Hights, New York
UK Distributor : Sangeeta Ltd., 22 Bricklane, London
অনলাইনে বই পেতে ভিজিট করুন : www.rokomari.com
অথবা ফোন করুন : Mobile : 01519521971-5
পরিবেশক : পাঠশালা, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১. খালি বোতল যে খালি নয় তা কীভাবে প্রমাণ করা যাবে? ৯
২. বাতাস যে অদৃশ্য শক্তি হিসেবে কাজ করে তা কিভাবে প্রমাণ করা যায়? ১০
৩. মানুষের শরীরের ফুসফুসে কত শক্তি আছে তা কিভাবে পরীক্ষা করবে? ১১
৪. আবহমণ্ডলের বায়ু-চাপ আমাদের পক্ষে খুব উপকারী। বায়ুচাপ না থাকলে স্ট্র বা পাইপ দিয়ে কোনো কিছুই পান করা যেত না–কীভাবে প্রমাণ করবে? ১২
৫. বায়ুমণ্ডলের চাপ মাপার যন্ত্রকে বলে ব্যারোমিটার। তুমি নিজে একটি ব্যারোমিটার বানিয়ে দেখ, কিভাবে তা কাজ করে এবং কিভাবে বায়ুর চাপ মাপা যায়। ১৩
৬. বায়ুর ওপর উত্তাপ প্রয়োগের প্রতিক্রিয়া কীভাবে পরীক্ষা করবে? ১৪
৭. আরও একটা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ কর যে, বায়ু উত্তপ্ত হলে তা সম্প্রসারিত হয়। ১৪
৮. একটি ফ্লাস্ক বা কাচের ফানেলের এক-চতুর্থাংশ পানিতে পূর্ণ। ফানেলের মুখে আটকানো একটি কর্ক। কর্কের ভেতরে প্রবেশ করানো সরু কাঁচের টিউবের একদিক পানিতে ডোবানো–এই অবস্থায় ফ্লাস্ক গরম করলে, প্রতিক্রিয়া কি হবে? ১৫
৯. তাপ প্রয়োগে বায়ু যেমন সম্প্রসারিত হয়, ঠাণ্ডায় তেমন সঙ্কুচিত হয়–প্রমাণ কর? ১৬
১০. বাতাসের যে ওজন আছে–তা কিভাবে প্রমাণ করবে? ১৭
১১. প্রত্যেকেই জানে বাতাস প্রবাহিত হয়। কিন্তু কিভাবে? বাতাসের গতির কারণ কি? ১৮
১২. ঠাণ্ডা পানি ভারী হয়, কিন্তু বরফ যা ঠাণ্ডা পানিরই আরেক রূপ–সেই বরফ পানিতে ভাসে কেন? ১৯
১৩. বাষ্পীভবন যে হয়–তা কীভাবে পরীক্ষা করবে? ২০
১৪. গোসলের পর গায়ে বাতাস লাগলে আমরা ঠাণ্ডা বোধ করি কেন? ২১
১৫. বাষ্পীভবনের ওপর প্রচণ্ড বাতাস এবং তাপের প্রতিক্রিয়া কি? ২২
১৬. গ্লাসে ঠাণ্ডা পানি বা কোলড্রিংস ঢালার পর গ্লাসের গায়ে বিন্দু বিন্দু পানি জমে? যতই সাবধানে ঢালো না কেন পানি জমবেই। কারণ কি? ২৩
১৭. বর্ষার সময় আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টি হয়, কখনও কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। কোথা থেকে এত বৃষ্টি আসে? ২৪
১৮. শীত প্রধান অঞ্চলে নদী, সাগর ইত্যাদি জমে বরফ হয়ে যায়। এই বরফের ওপরে মানুষ এক বিশেষ ধরনের জুতা, যাকে বলে আইস স্কেটস, পরে স্কেটিং খেলে। আইস স্কেটিং কীভাবে খেলা যায়? ২৫
১৯. কিছু কিছু কীট-পতঙ্গ খুব স্বাচ্ছন্দ্যে পানির ওপর চলাফেরা করে। পানির মতো তরল পদার্থের ওপর কিভাবে তা সম্ভব হচ্ছে? ২৬
২০. এক গ্লাস পানিতে একটি প্লাস্টিক বা কাচের টিউব রাখলে টিউবের পানির মাত্রা গ্লাসের পানির মাত্রার চেয়ে উপরে থাকে–কেন? ২৭
২১. সরাসরি আলোর নিচে রাখা পানিতে কয়েক ফোঁটা দুধ ফেললে তা উজ্জ্বল চকচকে হয়ে ওঠে কেন? ২৮
২২. স্বচ্ছতা ও অস্বচ্ছতার মাঝের অবস্থা হচ্ছে ঈষদচ্ছ, অর্থাৎ আলোকরশ্মি দ্বারা ভেদ্য হলেও স্বচ্ছ নয়। দ্রবনীয়তা ও অ-দ্রবনীয়তার মধ্যেও কি এমন অবস্থা আছে? ২৯
২৩. সার্কাসে 'মরণ ফাঁদ' নামে একটা মোটর সাইকেলের খেলা দেখানো হয়। চালক গোলাকার খাঁচার ভেতরে খুব দ্রুতগতিতে মোটর সাইকেল চালায় কিন্তু পড়ে যায় না, এমন কি খাড়াখাড়ি চালানো সত্ত্বেও পড়ে যায় না–কেন? ৩০
২৪. দ্রুতগামী বাস বা গাড়ির গতি হঠাৎ কমলে বা থামলে ভেতরে বসা ব্যক্তি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে–কেন? ৩১
২৫. থেমে থাকা বাস বা গাড়ি হঠাৎ চলতে শুরু করলে ভেতরে বসা ব্যক্তি পেছনের দিকে হেলে পড়ে–কেন? ৩২

www.pathagar.com

২৬. নদীর পানি যাতে উপচে পড়ে বন্যার সৃষ্টি না করে সেজন্য বাঁধ দেয়া হয় কিন্তু এই বাঁধের নিচের দিকটা ওপরের অংশের তুলনায় অনেক বেশি চওড়া করে দেয়া হয়–কেন? ৩৩
২৭. আমরা যে খাদ্য খাই তাতে শর্করা এবং চর্বিজাতীয় উপাদান থাকে, কোন খাদ্যে কোন উপাদান আছে তা নির্ধারণের কি কোনো সহজ উপায় আছে? ৩৪
২৮. বিজ্ঞানী গ্যালিলিও পিসার হেলানো টাওয়ার থেকে কয়েক টুকরো পাথর ফেলে প্রমাণ করেছিলেন যে, ওজনের তারতম্য সত্ত্বেও সবকটি পাথর একই সঙ্গে ভূমিতে পড়েছে। কিভাবে সম্ভব? ৩৫
২৯. হাতে ধরা অবস্থায় টেস্টটিউবের পানি ফোটে–তা কি সম্ভব? ৩৬
৩০. পানির উপর উত্তাপের প্রভাব আছে–প্রমাণ কর? ৩৭
৩১. পানি গরম করলে তার ওজনের পরিবর্তন হয়–প্রমাণ কর? ৩৮
৩২. শীতকালে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য আমরা উলের জামা-কাপড় পরি-কেন? ৩৯
৩৩. উত্তাপে ধাতু সম্প্রসারিত হয়-প্রমাণ কর? ৪০
৩৪. কঠিন বস্তু তাপ পরিবাহী–প্রমাণ কর? ৪১
৩৫. সব ধাতুই তাপ পরিবাহী কিন্তু তামা, পিতল ও অ্যালুমিনিয়ামের চেয়ে আরো ভালো পরিবাহী-প্রমাণ কর? ৪২
৩৬. অ্যাসিড ও ক্ষার যে আলাদা তা কীভাবে প্রমাণ কর? ৪৩
৩৭. আমারা যখন নিঃশ্বাস ত্যাগ করি তখন কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ত্যাগ করি–তা কিভাবে প্রমাণ করবে? ৪৪
৩৮. সত্যিই কী কার্বন-ডাই-অক্সাইডে আগুন নিভে যায়? ৪৫
৩৯. ঢাকা পাত্রের ভেতর বা আবদ্ধ জায়গায় জ্বলন্ত মোমবাতি নিভে যায় কেন? ৪৬
৪০. কার্বন-ডাই-অক্সাইড যে বাতাসের চেয়ে ভারী–প্রমাণ কর। ৪৭
৪১. লোহায় মরিচা পড়ার প্রক্রিয়ার সঙ্গে আবহাওয়ার একটা প্রভাব আছে–প্রমাণ কর। ৪৮
৪২. একটি বৈদ্যুতিক বাল্‌ব ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলো দিলেও তার ফিলামেন্ট জ্বলে যায় না–কেন? ৪৯
৪৩. কোনো ভারী বস্তু প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ করে তোলা যায় না, কিন্তু সেই ভার একটা পুলির সাহায্যে সহজেই তোলা যায়–কিভাবে? ৫০
৪৪. জেট বিমান কী নিয়মে চলে? ৫১
৪৫. বিমান কিভাবে ওড়ে? ৫২
৪৬. একটি গাড়ির তেলের ট্যাঙ্কে পেট্রল ভরে ড্রাইভার যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারে। কিন্তু গাড়ির চালিকা শক্তির উৎস কোথায়? ৫৩
৪৭. কাঠে আগুন ধরালে যে আগুনের শিখা দেখা যায়, তাতে কখনও লাল, কখনও নীল, কখনও সবুজ আবার কখনও পীত বর্ণের শিখা দেখা যায়। কিন্তু কোথা থেকে আগুনের শিখায় এই রঙ আসে? ৫৪
৪৮. আমরা জানি আলোকরশ্মি সরলরেখায় চলে। আর এই আলোকরশ্মির সরলরেখায় চলার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করা হয়েছে ক্যামেরা। কিন্তু আলোকরশ্মি যে সরলরেখায় চলে তা প্রমাণ কর? ৫৫
৪৯. আমরা চোখে সবকিছু উল্টো দেখি–কথাটা শুনতে মজার হলেও সত্যি। আমরা কি সত্যিই উল্টো দেখি? ৫৬
৫০. আয়না ও ছবির মধ্যের দূরত্ব, আয়না ও বস্তুর দূরত্বের সমান। প্রমাণ কর? ৫৭
৫১. আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজের ছব দেখা যায়, কিন্তু এমন অনেক কিছুই আয়নার ভেতরে দেখা যায়, যা আয়নার সামনে নেই। কেন এমন হয়? ৫৮
৫২. টেলিস্কোপ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা দূর আকাশের অনেক কিছু দেখতে পাই। কিন্তু কীভাবে? ৫৯
৫৩. পানি ভর্তি একটা পাত্রের গভীরতা ওপর থেকে দেখলে প্রকৃত গভীরতা থেকে কম মনে হয়। কিন্তু কেন এমন মনে হয়? ৬০
৫৪. কোনো বস্তুকে তখনই দেখা যায়, যখন তা থেকে প্রতিফলিত আলো চোখে এসে পড়ে। কিন্তু সবকিছুতেই যদি আলো প্রতিফলিত হয়, তাহলে সব বস্তুতে আয়নার মতো প্রতিফলন হয় না কেন? ৬১

www.pathagar.com

৫৫. সূর্যের আলোয় সাত রঙের সমাহার, বা রঙধনুতে সাত রঙ–এ কথা কি সত্যি? রঙধনুর আলো কিভাবে দেখা যায়। ৬২
৫৬. বড় গোলাকার চাকতি স্থির অবস্থায় নানা বর্ণের দেখা যায়, কিন্তু ঘুরন্ত অবস্থায় তা সম্পূর্ণ সাদা দেখায়–কেন? ৬৩
৫৭. পৃথিবীর চারপাশে তাকালে দেখা যাবে নানান রঙের বাহার। কিন্তু এত রঙ কোথা থেকে আসে আর কিভাবে এত রঙ সৃষ্টি হয়? ৬৪
৫৮. আলোর প্রতিফলন ও রঙের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে–কি সম্পর্ক? ৬৫
৫৯. গ্রীষ্মকালে আমরা হাল্কা রঙের পোশাক ব্যবহার করি কেন? ৬৬
৬০. সিনেমার পর্দা অর্থাৎ একটা সাদা কাপড়ের উপর কিভাবে সিনেমার ছবিগুলো দেখা যায়? ৬৭
৬১. সাধারণ একটা সূচকে কি চুম্বকে পরিণত করা যায়? ৬৮
৬২. দিক নির্ণয়ের জন্য একটা যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, যার নাম কম্পাস। কিভাবে একটা কম্পাস তৈরি করা যায় এবং তা কিভাবে কাজ করে? ৬৯
৬৩. আমরা জানি চুম্বকের আকর্ষণ শক্তি আছে। কিন্তু চুম্বক কোন ধরনের জিনিস আকর্ষণ করতে পারে? ৭০
৬৪. চুম্বকের শক্তি তার আকারের ওপর নির্ভর করে না–এ কথা কতখানি সত্যি? ৭১
৬৫. বিদ্যুৎ চুম্বকের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎ তরঙ্গ নিয়ন্ত্রণের সহজ উপায়, যাতে ইচ্ছামতো তা প্রবাহিত বা বন্ধ করা যায়–কিভাবে? ৭২
৬৬. অন্যান্য চুম্বকের মতো বিদ্যুৎ চুম্বকেরও কি উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু আছে? ৭৩
৬৭. অসদৃশ বা 'বিপরীত ধর্মী ইলেকট্রিক চার্জ' পরস্পরকে আকর্ষণ করে–প্রমাণ কর? ৭৪
৬৮. যে কোনো স্থানে এবং যে কোনো সময় এবং খুব সহজে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়-কিভাবে? ৭৫
৬৯. সিল্কের সুতোয় মুড়ি ঝুলিয়ে এক ধরনের খেলা খেলা যায় আর সে খেলার পিছনে কাজ করে বিদ্যুৎ–কিভাবে? ৭৬
৭০. স্থির বা নিশ্চল বিদ্যুৎ কি ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য নিরাপদ উপায়ে ধরে রাখা কিংবা সঞ্চারণ করা সম্ভব? ৭৭
৭১. সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামার সময় ওপরে বা নিচে বসানো সুইচের যে-কোনো একটি টিপে বাতি জ্বালানো যায়। কিন্তু কিভাবে এই বাতি জ্বলে? ৭৮
৭২. বৈদ্যুতিক বাল্‌বে প্রায় ফিউজ কেটে যায়। এই ফিউজ বস্তুটা কি? এর সুবিধাই বা কি? ৭৯
৭৩. আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে টেলিগ্রামের মাধ্যমে দ্রুত ভালো বা খারাপ খবর জানানো যায়। কিন্তু এই টেলিগ্রাম কিভাবে কাজ করে? ৮০
৭৪. তারের কয়েলে ঘুরন্ত একটি চুম্বক, কয়েলে বিদ্যুৎ প্রবাহের সঞ্চার করতে পারে–কিভাবে? ৮১
৭৫. শব্দ কি এবং কিভাবে শব্দের উৎপত্তি হয়? ৮২
৭৬. শব্দ কান পর্যন্ত পৌছাবার জন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় কি? ৮৩
৭৭. মানুষের হৃৎপিণ্ড দিন-রাত্রি চলে। কিন্তু নিজে তার চলা শোনা যায় না। হৃৎপিণ্ডের শব্দ নিজেও শোনা যাবে কিভাবে? ৮৪
৭৮. পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কিভাবে প্রমাণ করা যায় যে, গাছের কাণ্ড সবসময়ই উপরের দিকে এবং মূল নিচের দিকে বড় হতে থাকে? ৮৫
৭৯. মূলের সব অংশের বিকাশ একই রকম হয় বা বিশেষ কোনো অংশের বিকাশ অন্য অংশের চেয়ে বেশি হয়–পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর? ৮৬
৮০. গাছের শিকড় মাটি থেকে পানি শোষণ করে। কিন্তু সেই পানি উদ্ভিদের অন্যান্য অংশে কিভাবে পৌছায়? ৮৭
৮১. শিকড় মাটি থেকে পানি সংগ্রহ করে উদ্ভিদ ও গাছপালার প্রাণশক্তি যোগায়। কিন্তু তারপর সেই পানির কি হয়? ৮৮

www.pathagar.com

৮২. ভূ-পৃষ্ঠের কাছে বায়ু প্রবাহের দিক নির্ণয়ের জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাকে বলে 'উইন্ড ভেইন' বা হাওয়া নিশান। কিন্তু অতি উচ্চতায় বায়ু প্রবাহের দিক নির্ণয়ের জন্য কোন যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়? ৮৯
৮৩. বায়ু কখনও একই গতিতে প্রবাহিত হয় না–কখনও জোরে কখনও ধীরে। 'অ্যানিমোমিটার' যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর গতি মাপা হয়। ঘরে বসে কিভাবে 'অ্যানিমোমিটার' তৈরি করা যায়? ৯০
৮৪. বাতাস একদিক থেকে অন্যদিকে প্রবাহিত হয়। বাতাসের সঠিক দিক নির্ণয়ের জন্য যে যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয় তার নাম 'উইন্ড ভেইন' বা বায়ু নিশান। ঘরে বসে কিভাবে তা তৈরি করা যায়? ৯১
৮৫. যে যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয়, তাকে বলে হাইগ্রোমিটার। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর কিভাবে কোন যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা পরিমাপ করা যায়? ৯২
৮৬. তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব মাপার জন্য হাইড্রোমিটার যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। হাইড্রোমিটার যন্ত্রটা কিভাবে তৈরি করা যায় এবং কিভাবে তা কাজ করে প্রমাণ কর? ৯৩
৮৭. অবিরাম বৃষ্টি ঝরছে, কিন্তু শুধু বৃষ্টি দেখে বলা যাবে না, কি পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি মাপার যন্ত্রের নাম 'রেইন গেইজ' বা বৃষ্টিপাত পরিমাপক যন্ত্র। এই যন্ত্র কিভাবে তৈরি করা যায় এবং কিভাবে তা কাজ করে? ৯৪
৮৮. টারবাইন কি এবং পানির সাহায্যে টারবাইন কিভাবে ঘোরে? ৯৫
৮৯. ফটোমিটার কি? ফটোমিটার কিভাবে কাজ করে? ৯৬
৯০. খালি চোখে অতি ছোট বস্তুকে বড় করে দেখায় যে যন্ত্র তার নাম অনুবীক্ষণ যন্ত্র। ঘরে বসে কিভাবে একটা ছোট অনুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করা যায়? ৯৭
৯১. কোনো বাড়ি বা কোনো গাছের উচ্চতা তাতে না উঠে কিভাবে পরিমাণ করা যায়? ৯৮
৯২. পানি ও বাতাসের কারণে রূপার তৈরি জিনিসপত্রের উজ্জ্বলতা কিছুদিন পর ম্লান হয়ে যায় এবং কালচে ভাব আসে। এই কালচে ভাব কিভাবে দূর করা যায়? ৯৯
৯৩. স্ট্যালাক্টাইট্স্ এবং স্ট্যালাগ্মাইট্স্ কি? ১০০
৯৪. আঙুলের ছাপ অপরাধীদের ধরতে কিভাবে সাহায্য করে? ১০১
৯৫. পৃথিবীতে বসে পৃথিবী থেকে মহাকাশের বিভিন্ন বস্তুর দূরত্ব নিখুঁতভাবে পরিমাপ সম্ভব। কিভাবে সম্ভব? ১০২
৯৬. চাঁদ বা মহাকাশের অন্যান্য বস্তুর তাপমাত্রা কিভাবে নির্ণয় করা যায়? ১০৩
৯৭. জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মহাকাশে বিভিন্ন বস্তুর উত্তাপ পরিমাপের এক নিজস্ব পদ্ধতি আছে। কি সেই পদ্ধতি? ১০৪
৯৮. এমন কি হতে পারে আমরা যা খাচ্ছি তার স্বাদ জিহ্বা পুরোপুরি বুঝতে পারছে না? ১০৫
৯৯. মানুষের ত্বকের স্পর্শকাতারতা তাকে ধোকা দেয়। এটা কিভাবে সম্ভব? ১০৬
১০০. মানুষের চোখে অনেক সময় ধাঁধা লাগে! এই ধাঁধা লাগাটা কি? ১০৭

www.pathagar.com

খালি বোতল যে খালি নয় তা কীভাবে প্রমাণ করা যাবে?

উপকরণ : একটি শূন্য কাচের বোতল, একটি পানি ভর্তি পাত্র।

কার্যপ্রণালী : খালি কাচের বোতলের মুখের ছিপিটি খুলে রাখ। বোতলের মুখটা নিচের দিকে উপুড় করে পানি ভর্তি পাত্রে ঢুবিয়ে দাও। ভালোভাবে প্রতিক্রিয়া লক্ষ কর। বোতলের ভেতরে কিছুটা পানি ঢুকবে। বোতল পানির আরো গভীরে ঢুবিয়ে দাও, কিন্তু বোতলের ভেতর আর পানি ঢুকছে না। প্রথম যে পানিটুকু ঢুকেছিল সেটুকুই আছে। অথচ বোতলের বাইরে পানি ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠছে। এর কারণ কি? এই পরীক্ষায় একটা বিষয় স্পষ্ট যে, বোতলের ভেতরে এমন কিছু একটা আছে, যা পানিকে বোতলের ভেতরে ঢুকতে বাধা দিচ্ছে। সেই অদৃশ্য বস্তুটা কি? সেই অদৃশ্য বস্তুটা হলো বাতাস।

এরপর বোতলটা একদিকে সামান্য একটু কাত কর। কি দেখতে পাচ্ছো? দেখা যাবে বোতলের মুখ থেকে বুদবুদ বেরোচ্ছে। আর তা পানির ওপরে এসে ফেটে যাচ্ছে। এই বুদবুদ বাতাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

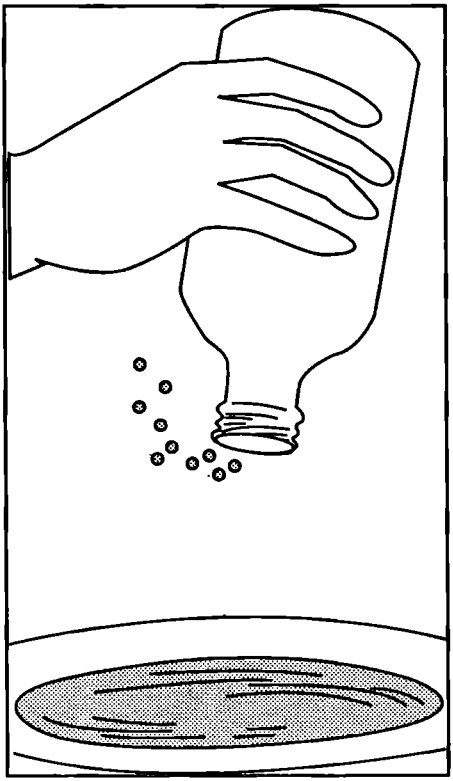

বোতলের ভেতরে আটকা পড়া বাতাস, বোতল কাত করায় বেরিয়ে আসার সুযোগ পাচ্ছে, এবং বাতাস বেরিয়ে যাওয়ার ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হচ্ছে, পানি তা পূরণ করছে।

ফলাফল : অতএব আপাত দৃষ্টিতে একটা খালি বোতল যে খালি নয়, তার ভেতর যে বাতাস আছে উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে তা প্রমাণিত হলো।

www.pathagar.com

প রী ক্ষা ২

বাতাস যে অদৃশ্য শক্তি হিসেবে কাজ করে তা কিভাবে প্রমাণ করা যায়?

উপকরণ : দুটি খালি বোতল, কুপি বা কাগ ও একটি পানিভর্তি পাত্র।

কার্যপ্রণালী : একটি বোতলের মুখে কুপি রেখে, পানি ঢাল, বোতলের ভেতর পানি ঢুকবে কিন্তু বোতলটি পানিতে পূর্ণ হবে খুব ধীরে ধীরে।

এবার কুপিটা সামান্য বাঁকা করে তুলে ধরো, দেখবে পানি পড়ার গতি হঠাৎ বেড়ে গেছে। বলতে পারো, কেন এটা হচ্ছে? বলা মোটেই কঠিন নয়। কুপির ভেতর দিয়ে যখন তুমি বোতলে পানি ভর্তি করছো, তখন বোতলের ভেতরে আটকা পড়া বাতাস ভেদ করে সেই পানি পড়ছে, কারণ বাতাস তার বেরোবার

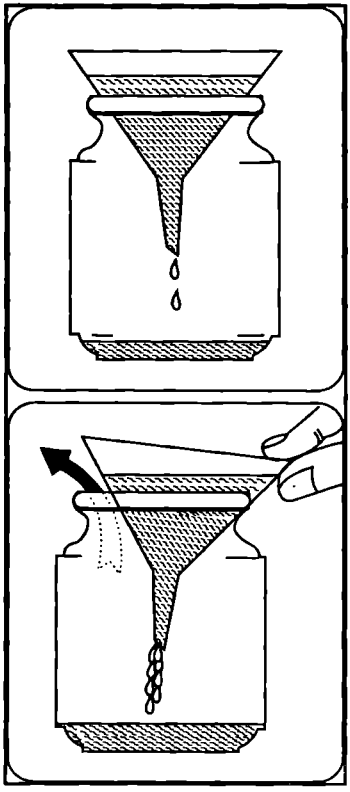

সহজ পথ পাচ্ছে না। বোতলের মুখে রাখা কুপিতে বোতলের মুখটা সম্পূর্ণ ঢাকা থাকলেও এয়ারটাইট নয়। ভেতরের বাতাস সামান্য পথ পেয়ে বেরোবার চেষ্টা করছে। কাজেই ভেতরের বাতাস যে গতিতে বেরোতে পারছে, কুপির মুখ দিয়ে পানি সেই গতিতেই বোতলে প্রবেশ করছে। একই নিয়মে, কুপিটা অল্প বাঁকা করে তুলে ধরাতে বাতাস বাইরে আসতে পারছে অতি সহজে এবং পানিও ভেতরে ঢুকতে পারছে অনেক বেশি গতিতে।

ফলাফল : অতএব আমরা যে বাতাস দেখি না, কিন্তু অনুভব করি, সেই বাতাস সব সময় অদৃশ্য শক্তি হিসেবে আমাদের কাজে সাহায্য করে। এছাড়াও বাতাস শক্তি ব্যবহার করে আরও অনেক কাজ করা যায়। এমনকি বাতাস শক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎও উৎপন্ন করা যায়।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ৩

মানুষের শরীরের ফুসফুসে কত শক্তি আছে তা কিভাবে পরীক্ষা করবে?

উপকরণ : একটা বড় মাপের গামলা, পানি, মুখ খোলা একটা বড় বোতল, ফুঁ দেয়ার জন্য একটা রাবারের নল বা পাইপ।

কার্যপ্রণালী : বড় মাপের গামলায় ৫ থেকে ৭ সেন্টিমিটার পর্যন্ত পানি ভর্তি কর। খোলা বোতলটি পানি ভর্তি করে তার ছিপি শক্ত করে এঁটে দাও। এবার বোতলটি উল্টো দিকে করে গামলার পানিতে ডুবিয়ে বোতলের ছিপিটি খুলে নাও। বোতলের ভেতরে পানির মাত্রা চিহ্নিত কর এবং বোতলটা একদিকে কাত কর। এখন তোমার দরকার একটা ফাঁপা রাবারের নল, যার একটা দিক থাকবে ওল্টানো বোতলের দিকে, অন্যদিকটা গামলার বাইরে।

এবার তুমি তোমার ফুসফুসের শক্তি পরীক্ষার জন্য তৈরি হও। গভীরভাবে শ্বাস টেনে, রাবারের নল দিয়ে জোরে সেই বাতাস বোতলের ভেতরে প্রবেশ করাও। একই সঙ্গে লক্ষ্য কর, কি পরিমাণ পানি তুমি সরাতে পারছ এবং সেই জায়গাটা বাতাস দিয়ে পূর্ণ করতে পারছ। পানির মাত্রাও চিহ্নিত করতে ভুলবে না। দুই চিহ্নের মধ্যে পার্থক্যটুকু তোমার ফুসফুসের শক্তি নির্দেশ করছে। তবে মনে রাখবে, টিউব বা নলের ভেতর দিয়ে শ্বাস ছাড়ার সময় তাতে যেন ছেদ না পড়ে বা শ্বাস টানা না হয়। কয়েকদিন অভ্যাসের পর যদি দুই চিহ্নের মধ্যে পার্থক্য বৃদ্ধি পায়, তাহলে বুঝবে তোমার ফুসফুসের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

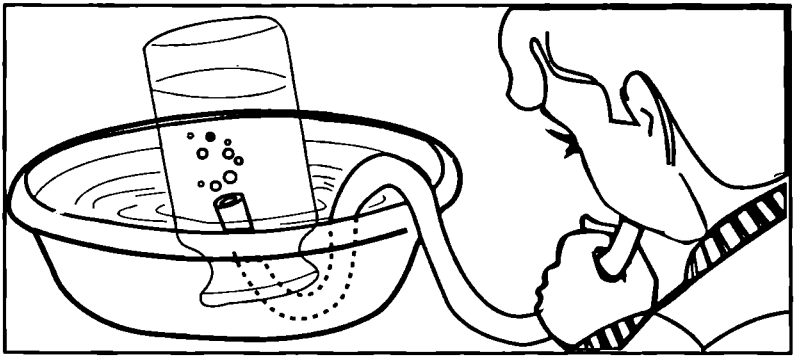

ফলাফল : এভাবেই মানুষের শরীরের ভেতরে যে ফুসফুস আছে এবং তার কতটুকু শক্তি আছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই পরীক্ষা মানুষের ফুসফুসের শক্তি শুধু বৃদ্ধি করবে না, নিয়মিত প্র্যাকটিস করলে তোমার শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়াতন্ত্রের উন্নতির পক্ষে একটা ভালো ব্যায়ামও হবে।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ৪

আবহমণ্ডলের বায়ু-চাপ আমাদের পক্ষে খুব উপকারী। বায়ুচাপ না থাকলে স্ট্র বা পাইপ দিয়ে কোনো কিছুই পান করা যেত না—কীভাবে প্রমাণ করবে?

উপকরণ : এক গ্লাস পানি, দুটো স্ট্র বা পাইপ।

কার্যপ্রণালী : পানি বা পছন্দমতো ড্রিংস নাও। তাতে দুটো স্ট্র বা পাইপ ফেলে দাও। এবার একটা স্ট্রয়ের ওপর দিকটায় মুখ দিয়ে তা থেকে হাওয়াটুকু টেনে নাও অর্থাৎ স্ট্রয়ের মধ্যে যেটুকু হাওয়া ছিল তা এখন আর নেই।

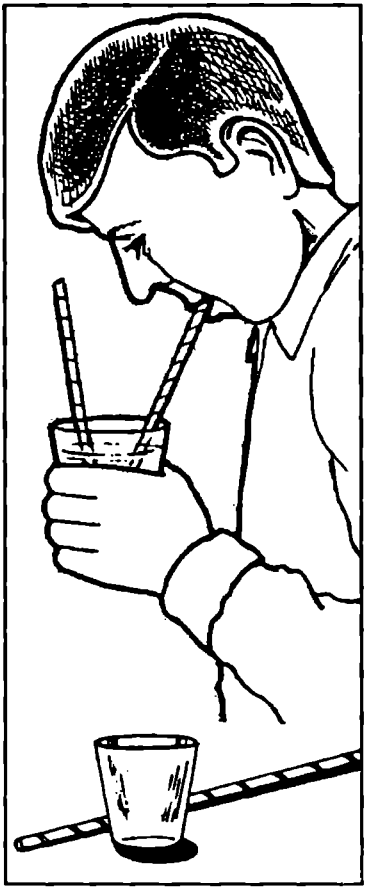

স্ট্রয়ের ভেতরের হাওয়াটুকু তোমার মুখে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের হাওয়া ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করবে সেই শূন্যতা পূরণ করতে। ভেতরে ঢোকার জন্য হাওয়া পানীয়ের ওপর তখন চাপ দিতে থাকবে। এই ভাবে তুমি হাওয়া টানতে থাকবে স্ট্রয়ের ভেতরে। বাইরের হাওয়া পানীয়ের ওপর চাপ দেবে ভেতরে ঢোকার জন্য। এর ফলে পানীয় তোমার মুখ পর্যন্ত ক্রমাগত যেতে থাকবে, যতক্ষণ না গ্লাসের পানীয় শেষ হচ্ছে।

দ্বিতীয় স্ট্র পানীয়ের মধ্যে খালিই পড়ে থাকবে, কারণ তার ভেতরের বায়ুর চাপে কোনো তারতম্য হচ্ছে না।

ফলাফল : অতএব এটা প্রমাণিত হলো যে, বায়ুর চাপ না থাকলে আমরা কেউই স্ট্র বা পাইপ বা প্লাস্টিকের নল দিয়ে জুস, ডাবের পানি ইত্যাদি কিছুই টেনে খেতে পারতাম না।

www.pathagar.com

প রী ক্ষা ৫

বায়ুমণ্ডলের চাপ মাপার যন্ত্রকে বলে ব্যারোমিটার। তুমি নিজে একটি ব্যারোমিটার বানিয়ে দেখ, কিভাবে তা কাজ করে এবং কিভাবে বায়ুর চাপ মাপা যায়।

উপকরণ : বড় মুখওয়ালা একটা বোতল, বোতলের মুখ আটকানোর জন্য বেলুনের পাতলা আস্তরণ, রাবার ব্যান্ড, একটা ড্রিঙ্কিং স্ট্র, আঠা ও কার্ডবোর্ড।

কার্যপ্রণালী : বোতলের মুখ বেলুনের পাতলা আস্তরণ দিয়ে টান টান করে বেঁধে দাও। টান থাকার জন্য বেলুনের আবরণটা টেনে রাবারের ব্যান্ড দিয়ে ভালো করে বেঁধে দাও। এখন ড্রিঙ্কিং স্ট্রয়ের একটা দিক টান টান করে বাঁধা বেলুনের ঠিক মাঝখানে সুপার গ্লু বা ঐ জাতীয় আঠা দিয়ে লাগিয়ে দাও। আঠা শুকিয়ে যাবার পর, আরেকটা জিনিস করা জরুরি। সেটা হচ্ছে, কার্ডবোর্ডের বাক্সের সাদা দিকটার একটা খণ্ড খাড়াভাবে বোতলের পাশে এমনভাবে রাখ যাতে তা স্ট্রয়ের অন্য দিকটার ঠিক পেছনে থাকে। কার্ডবোর্ড বাক্সের এই সাদা খণ্ডটির গায়ে পরিমাপসূচক 'হাই' ও 'লো' লিখে রাখতে হবে।

ব্যারোমিটার এখন তৈরি। আর আবহাওয়ার চাপ যখন বেশি থাকে, তখন সবদিকেই তার চাপ সমান থাকে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে বোতলের ওপর সবদিক থেকে সমান চাপ থাকবে, যার ফলে বেলুনটা সামান্য পরিমাণে বোতলের ভেতরের দিকে ঝুঁকে যাবে। অন্যদিকে এরই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ, স্ট্রয়ের মুক্ত দিকটা অর্থাৎ স্ট্রয়ের যে অংশটা বাইরের দিকে রয়েছে, সেই অংশটা ওপরের দিকে উঠে বায়ুর চাপ বৃদ্ধির কথাই নির্দেশ করবে।

অন্যদিকে, বায়ু-চাপ যদি হ্রাস পায়, তাহলে বেলুনের আবরণ ভেতরের দিকে ঝুঁকে পড়বে না। কিন্তু বায়ু-চাপ যদি বোতলে বায়ুর চাপের চেয়ে কমে যায়, তাহলে বেলুন ফুলে উঠবে এবং স্ট্রয়ের বাইরের অংশটা নিম্নমুখি হয়ে বায়ুর চাপ হ্রাস পাওয়ার নির্দেশ দেবে।

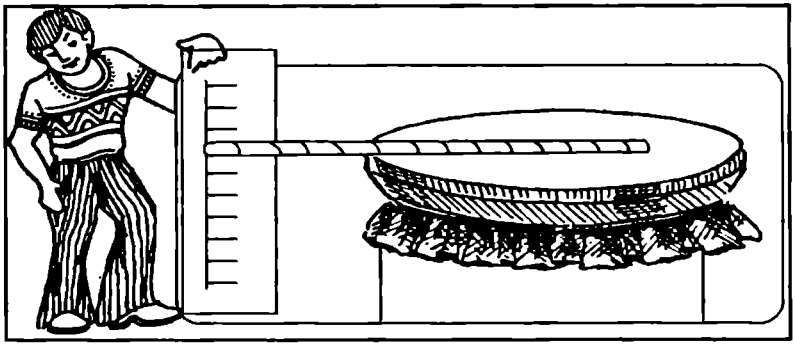

ফলাফল : এভাবেই ঘরে বসে বায়ুর চাপ মাপার যন্ত্র ব্যারোমিটার তৈরি করা যায় এবং ঘরে বসেই প্রমাণ করা যায় বায়ুমণ্ডলের চাপ নিম্নমুখী না ঊর্ধ্বমুখী।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ৬

বায়ুর ওপর উত্তাপ প্রয়োগের প্রতিক্রিয়া কীভাবে পরীক্ষা করবে?

উপকরণ : কর্কসহ ফ্লাস্ক বা এই জাতীয় বোতল, একটা সরু টিউব, একটা পানি ভরতি গামলা।

কার্যপ্রণালী : কর্কের মুখে ছিদ্র করে তার ভেতর দিয়ে টিউবটা ঢুকিয়ে দাও। টিউবসহ কর্কটা বোতলের মুখে বেশ শক্ত করে এঁটে দাও। গালা বা গ্রিস দিয়ে মুখের জোড়া জায়গাটা এয়ারটাইট করে দাও। যাতে বাতাস ঢুকতে না পারে। একটা জিনিস মনে রাখবে, বোতলের গ্লাসা যত পাতলা হবে এই পরীক্ষা তত নিখুঁত হবে।।

এখন বোতলের মুখ নিচের দিকে করে এমনভাবে ধর যাতে টিউবের অন্য দিকটা একটা পাত্রে রাখা পানিতে ডুবে থাকে। এবার তোমার বন্ধু বা ঘরের কাউকে বলো, হাত দুটো জোরে জোরে ঘষে বোতলটা ধরার জন্য। এবার তুমি দেখতে পাবে, টিউবের মুখ থেকে বুদবুদ বেরিয়ে এসে ফেটে যাচ্ছে।

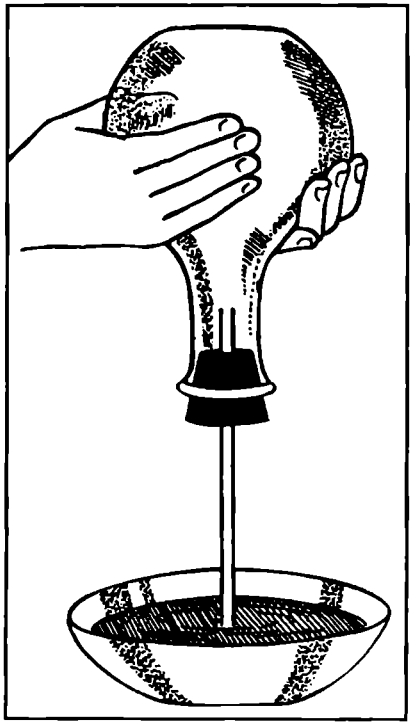

আরেকটা জিনিস করতে পারো, এক টুকরো কাপড় রোদে গরম করে বোতলের চারপাশে জড়িয়ে দাও। এবার দেখেছো কি হচ্ছে? আরো বুদবুদ টিউবের মুখ থেকে বেরিয়ে পানির ওপরে উঠে আসছে। তাই না?

এর কারণ হলো, হাত বা কাপড়ের উত্তাপে বোতলের ভেতরের বাতাস উত্তপ্ত হচ্ছে, উত্তপ্ত হচ্ছে বলে তা সম্প্রসারিত হচ্ছে। সম্প্রসারিত বায়ু বোতলের ভেতরে থাকতে না পেরে টিউবের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসছে বুদবুদের আকারে।

ফলাফল : এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, বাতাসে তাপ প্রয়োগ করলে বাতাস সম্প্রসারিত হয়।

www.pathagar.com

প রী ক্ষা ৭

আরও একটা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ কর যে, বায়ু উত্তপ্ত হলে তা সম্প্রসারিত হয়।

উপকরণ : একটি ফ্লাস্ক বা ঐ জাতীয় কাচের পাত্র (পাওয়া যাবে ল্যাবরেটরির সরঞ্জাম বিক্রির দোকানে), একটা বেলুন, বুনসেন বার্নার, মোমবাতি, অথবা কুপি।

কার্যপ্রণালী : এই পরীক্ষায় ফ্লাস্ক বা কাচের পাত্রের মুখটা একটা বেলুন দিয়ে আটকে দাও। অর্থাৎ বেলুনের মুখটা যেন পাত্রের মুখে ভালোভাবে আটকে থাকে। এখন ফ্লাস্কটা ধীরে ধীরে বুনসেন বার্নার বা মোমবাতির আগুন দিয়ে ধীরে ধীরে গরম কর। গরম করলে কী হবে বোঝায় যাচ্ছে।

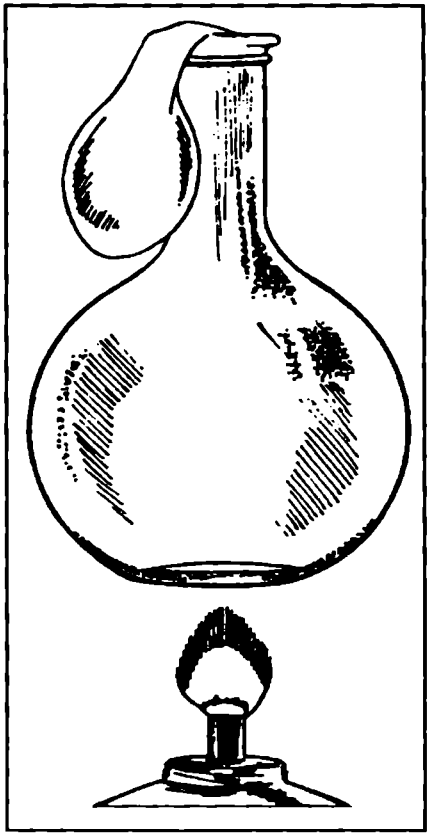

গরম করলে বেলুনটা ফুলে উঠবে। কিন্তু বেলুনের ভেতর হাওয়া আসছে কোথা থেকে?

উত্তর সহজ। আগের পরীক্ষার মতোই উত্তপ্ত হতেই ফ্লাস্ক বা কাচের পাত্রের ভেতরের হাওয়া সম্প্রসারিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইবে। বাইরে বেরিয়ে মুখের বেলুনে প্রবেশ করবে। ফলে বেলুন ফুলে উঠবে।

ফলাফল : এই পরীক্ষার মাধ্যমে আরও ভালোভাবে প্রমাণিত হলো যে, বাতাসে তাপ প্রয়োগ করলে বাতাস সম্প্রসারিত হয়।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ৮

একটি ফ্লাস্ক বা কাচের ফানেলের এক-চতুর্থাংশ পানিতে পূর্ণ। ফানেলের মুখে আটকানো একটি কর্ক। কর্কের ভেতরে প্রবেশ করানো সরু কাঁচের টিউবের একদিক পানিতে ডোবানো–এই অবস্থায় ফ্লাস্ক গরম করলে, প্রতিক্রিয়া কি হবে?

উপকরণ : একটি কাচের ফ্লাস্ক বা ফানেল, ফানেলের মুখ আটকানোর জন্য একটি রাবারের কর্ক, একটি সরু কাচের টিউব।

কার্যপ্রণালী : কাচের ফানেলের এক-চতুর্থাংশ পানিতে পূর্ণ কর। ফানেলের মুখটি বেশ শক্ত করে রাবারের কর্ক দিয়ে বন্ধ করে দাও। এবার কর্কের অর্থাৎ স্টপারের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করাও একটি কাচের টিউব। লক্ষ্য রাখবে টিউবের নিচের দিকটা যেন পানিতে ডোবানো থাকে। বোতলের রাবারের কর্কের জায়গাটা যাতে ভালোভাবে এয়ারটাইট থাকে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখবে।

এবার তোমার হাত দুটো ঘষে-ঘষে পানির উপরিভাগের ফানেলের গায়ে রাখ। এরপর ফানেলের গায়ে রাখ রোদে গরম করা এক টুকরো কাপড়। এখন কি দেখা যাচ্ছে? ফানেলের উভয় ক্ষেত্রেই টিউবের ভেতর দিয়ে ওপর দিকে উঠছে নিজে থেকেই।

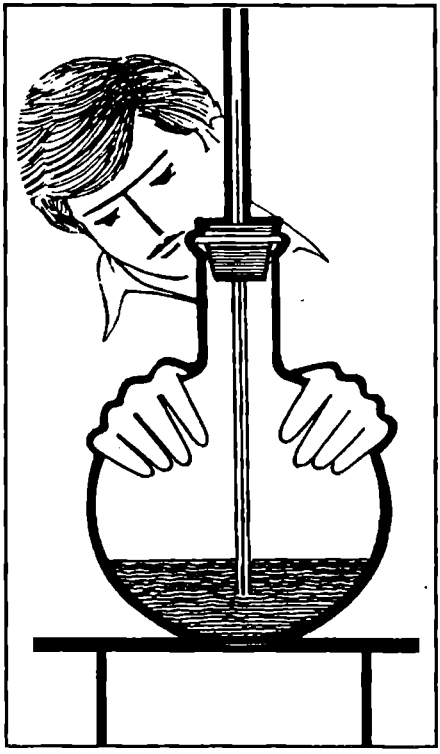

আশা করি বুঝতে পেরেছো কারণটা। তোমার হাতের উত্তাপ এবং গরম কাপড়ের উত্তাপে বোতলের ভেতরের বাতাস সম্প্রসারিত হচ্ছে। সম্প্রসারণের ফলে পানির ওপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে এবং চাপ সৃষ্টির ফলে কিছু পানি টিউব দিয়ে ওপরের দিকে উঠছে।

ফলাফল : এই পরীক্ষার মাধ্যমে এবারও প্রমাণিত হলো যে তাপ প্রয়োগের ফলে ফানেলের ভেতরের বাতাস সম্প্রসারিত হচ্ছে। আর এই সম্প্রসারণের ফলে পানির ওপর চাপ সৃষ্টি করে পানি ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

তাপ প্রয়োগে বায়ু যেমন সম্প্রসারিত হয়, ঠাণ্ডায় তেমন সঙ্কুচিত হয়–প্রমাণ কর?

উপকরণ : কাচের ফ্লাস্ক, পানি, বুনসেন বার্নার।

কার্যপ্রণালী : কাচের ফানেলে অল্প পানি নিয়ে গরম কর। কিছুক্ষণ পর পানি ফুটতে শুরু করলে, তখন ফানেলটি বার্নারের শিখা থেকে সরিয়ে নিয়ে তার মুখ একটা রাবারের বেলুন দিয়ে আটকে দাও। কিছুক্ষণ পর লক্ষ্য করবে, বেলুনটি ফানেলের দিকে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হচ্ছে। এমনটা কেন হচ্ছে? বোতল যখন উত্তপ্ত হচ্ছে, বোতলের ভেতরের বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে পানিও তখন উত্তপ্ত হচ্ছে। উত্তপ্ত বাতাস সম্প্রসারিত হয়ে ফানেলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। একইভাবে পানি গরম হলে, তার কিছু পরিমাণ বাষ্পে পরিণত হয়, যা আরও কিছু বাতাস ফানেল থেকে বের করে দেয়। যেহেতু ফানেলের মুখে আটকানো আছে বেলুন দিয়ে, সেহেতু বাতাস ও বাষ্প সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসার পথ পাচ্ছে না।

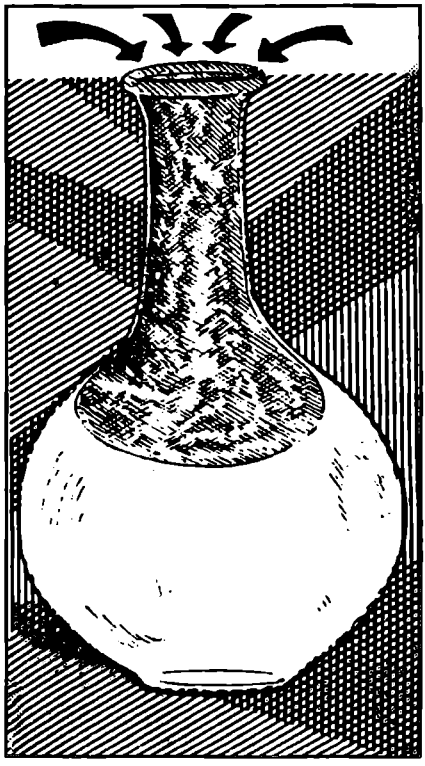

এরপর যখন ফানেল গরম করা বন্ধ করলে, তখন ভেতরের বাষ্প ঠাণ্ডা হতে লাগলো ধীরে ধীরে এবং শেষে তা আবার পানিতে পরিণত হলো। ফানেলের ভেতরের বাতাসও সঙ্কুচিত হতে থাকলো, যার ফলে বেরিয়ে যাওয়া বাতাস আবার শূন্যস্থান পূরণ করতে চায়। কিন্তু বেলুন তাতে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কাজেই এর একমাত্র পথ হলো বেলুনকে সঙ্গে নিয়েই বোতলে ফিরে আসা। আর ঠিক সেটাই ঘটছে।

ফলাফল : এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো, তাপ প্রয়োগে বাতাস যেমন সম্প্রসারিত হয়, ঠাণ্ডায় তেমনি সঙ্কুচিত হয়।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ১০

বাতাসের যে ওজন আছে–তা কিভাবে প্রমাণ করবে?

উপকরণ : দুটি বেলুন, সুতো এবং এক মিটার লম্বা বাঁশের কঞ্চি, একটা আলপিন।

কার্যপ্রণালী : বাতাসের যে ওজন আছে–এই তত্ত্বটি প্রমাণ তোমার কাছে কঠিন মনে হতে পারে। কিন্তু এই তত্ত্ব প্রমাণ করা কঠিন কিছু নয়, বরং খুব সহজ। কারণ এটা একটা বিশেষ ধরনের পরীক্ষা। এর মৌলিক ধারণা বা সূত্রটা যদি একবার মাথায় ঢোকে, তাহলেই তোমার কাছে তা পানির মতো সহজ হয়ে যাবে।

প্রথমে সুতো দিয়ে বাঁশের কঞ্চির মাঝখানে বেঁধে, বাঁশটা শূন্যে ঝুলিয়ে দাও, যাতে বাঁশ সমান্তরাল অবস্থায় থাকে। বেলুন দুটি সমানভাবে ফোলাও এবং সমান দৈর্ঘ্যের সুতো দিয়ে বেলুন দুটি বাঁধ।

এরপর একটি বেলুনের সুতো বাঁশের এক কোণায় বাঁধ এবং অপর বেলুনের সুতোটায় ফাঁস দিয়ে রাখ যাতে বাঁশের কঞ্চিটাকে সমান্তরাল অবস্থায় রাখার জন্য বেলুনকে আগে-পিছে করা যায়।

এখন কঞ্চির সমান্তরাল অবস্থায় বোঝা যাচ্ছে দুটি বেলুনের ওজন সমান। এবার আলপিন দিয়ে একটা বেলুন ফুটো করে দাও। দেখবে বাঁশটা একদিকে ঝুলে গেছে। এর দ্বারা প্রমাণ হয়, বাতাসের ওজন আছে। একদিকের বেলুনের বাতাস বেরিয়ে যাওয়ার ফলে কঞ্চিটি একপাশে হেলে পড়ল। বেলুনের বাতাস ছাড়া অন্য সবকিছু একই আছে। কোনো পরিবর্তন হয়নি। কাজেই, বেলুনের বাতাসের ওজনের জন্যই কঞ্চিটি সমান্তরাল অবস্থায় ছিল। বাতাস বেরিয়ে যাওয়ার ফলে একদিকের বেলুনের ওজন কমে গেল এবং বাতাস ভর্তি বেলুনের দিকের অংশ ভারি হয়ে গেল। বাঁশের কঞ্চি বাতাসের ভার অনুযায়ী সেদিকে নিচু হয়ে গেল।

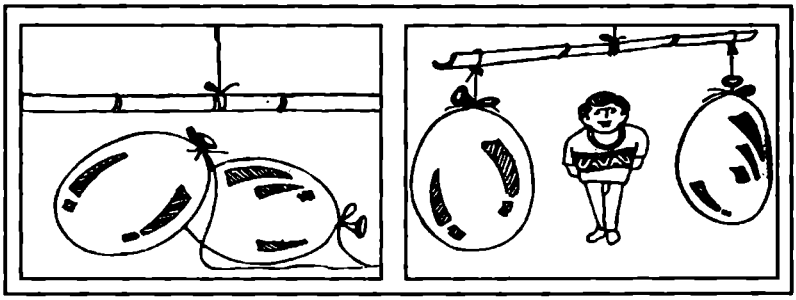

ফলাফল : এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো, যে বাতাস চোখে দেখা যায় না শুধু অনুভব করা যায় সেই বাতাসেরও ওজন আছে।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ১১

প্রত্যেকেই জানে বাতাস প্রবাহিত হয়। কিন্তু কিভাবে? বাতাসের গতির কারণ কি?

উপকরণ : কয়েক টুকরো কাগজ দিয়ে বানাতে হবে একটা চরকি বা ঘুরঘুরি। আর লাগবে আঠা, আলপিন, চুলো বা বুনসেন বার্নার।

কার্যপ্রণালী : এই পরীক্ষার জন্য প্রথমে বানাতে হবে একটা বায়ু-চক্র বা চরকি। এটা বানানো কঠিন কিছু নয়। দৈর্ঘ্যে ২৫ সেন্টিমিটার ও প্রস্থে ২৫ সেন্টিমিটার অর্থাৎ বর্গাকার এক শিট কাগজ নিয়ে কোণাকুণি দুটি রেখা টান। দুটি রেখা পরস্পরকে যেখানে ছেদ করছে, সেখানে ১০ সেন্টিমিটার ব্যাসের একটি বৃত্ত অঙ্কিত কর। এবার কাঁচি দিয়ে বৃত্তের বর্হিভাগ পর্যন্ত চার রেখা বরাবর অংশগুলো কাটো। এখন প্রতিটি অংশের কোণগুলি বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দাও। মাঝখানে একটা আলপিন ঢুকিয়ে তার সঙ্গে জুড়ে দাও একটা লম্বা সরু কাঠি। ব্যস, তৈরি হয়ে গেল ঘুরঘুরি বা চরকি।

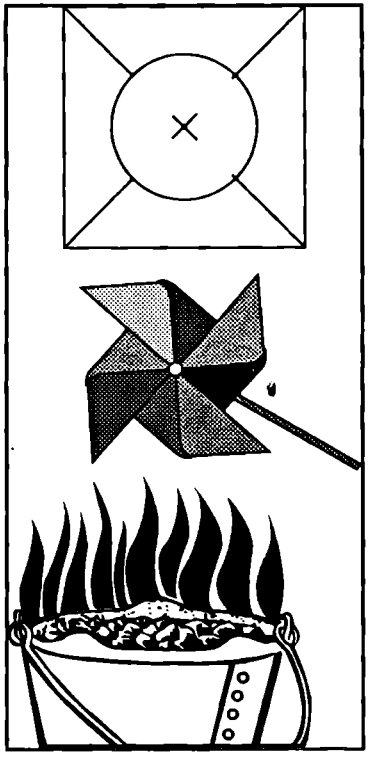

চুলো বা বুনসেন বার্নারের প্রায় ৫০ সেন্টিমিটার ওপরে ধর এই ঘুরঘুরি। ঘুরঘুরি আপনাআপনি ঘুরতে শুরু করবে। কিন্তু উত্তাপের উৎস থেকে সরিয়ে নিলেই ঘোরা বন্ধ হয়ে যাবে। এটা কেন হয়?

উত্তাপে বায়ু যখন সম্প্রসারিত হয়, তখন এর অনুগুলি (মলিকিউলস) উত্তাপের দরুণ হালকা হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে বায়ুর যে অংশ উত্তাপ থেকে বাইরে আছে, তা ভারী অবস্থায় নিচের দিকে নামতে থাকে এবং গরম ও হালকা বায়ুকে ওপরের দিকে ঠেলে দেয়। এভাবেই চক্রাকারে প্রবাহ সঞ্চারিত হয় এবং বাতাস গতি লাভ করে।

ফলাফল : এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো, যে বাতাস প্রবাহিত হয় এবং বাতাসের গতি আছে।

www.pathagar.com

প রী ক্ষা ১২

ঠাণ্ডা পানি ভারী হয়, কিন্তু বরফ যা ঠাণ্ডা পানিরই আরেক রূপ—সেই বরফ পানিতে ভাসে কেন?

পানি ঠাণ্ডা হলে তার আয়তন কমে যায় এবং ভারী হয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়া একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা পর্যন্ত চলে এবং সেটা হলো ৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেট পর্যন্ত। এই তাপমাত্রায় পানির ঘনত্ব সর্বোচ্চ হয় এবং আয়তন হয় সর্বনিম্ন।

পানি যখন বরফের আকার নেয়, তখন তার আয়তন বাড়ে, অর্থাৎ এই অবস্থায় বেশি জায়গা নেয়। অবশ্য পানি বরফে পরিণত হলে তার ভর অপরিবর্তিত থাকে। কোনো কিছুই যুক্ত বা বিযুক্ত করা হচ্ছে না। কাজেই স্পষ্টতঃই আয়তন বাড়লেও ভর অপরিবর্তিত থাকছে। এর অর্থ পানি যখন বরফে পরিণত হচ্ছে, এর ঘনত্ব তখন কমে যাচ্ছে। পানির ঘনত্ব থেকে বরফের ঘনত্ব কম তাই পানিতে ভাসবে। যেহেতু, কাঠ, কর্ক ইত্যাদির মতো বরফের ঘনত্ব পানির ঘনত্ব থেকে কম, সেহেতু তা পানিতে ভাসে।

এই বৈশিষ্ট্যের সুবিধা অসুবিধা উভয় দিকই আছে। শীত প্রধান দেশে, তাপমাত্রা খুব কমে যায় বলে নদীর পানি জমে যায়। বস্তুতঃ নদীর পানির ওপরের অংশই জমে যায়, নিচের দিকে পানি তরল অবস্থাতেই থাকে এবং থাকে বলেই পানির নিচে উদ্ভিদ ও প্রাণী বেঁচে থাকে। অন্যদিকে, সমুদ্র ভ্রমণকারীদের পক্ষে হিমশৈলের বেশির ভাগই পানির নিচে থাকে। জাহাজের ওপর দিয়ে গেলে এই হিমশৈলে ধাক্কা খেয়ে জাহাজ ডুবে যেতে বা অচল হয়ে যেতে পারে।

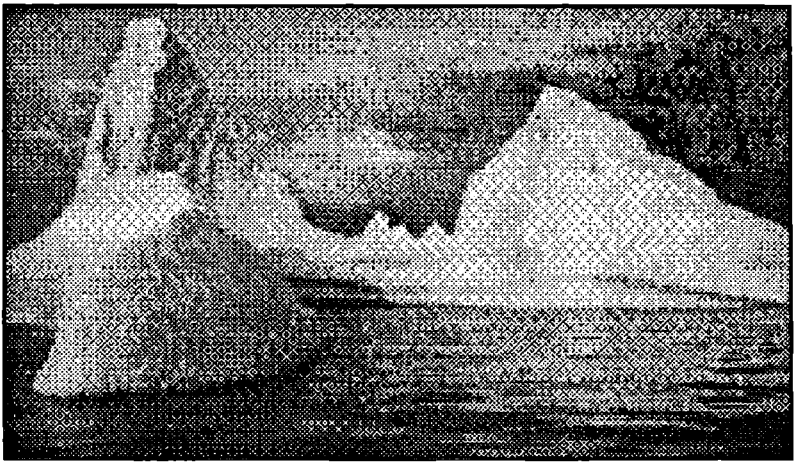

www.pathagar.com

প রী ক্ষা ১৩

বাষ্পীভবন যে হয়—তা কীভাবে পরীক্ষা করবে?

উপকরণ : একই রকমের তিনটি প্লেট, চামচ ও পানি।

কার্যপ্রণালী : প্লেট তিনটি পাশাপাশি রেখে, প্রথম প্লেটে এক চামচ, দ্বিতীয় প্লেটে দুই চামচ এবং তৃতীয় প্লেটে তিন চামচ পানি দিতে হবে। এবার প্লেটগুলো লক্ষ্য করতে হবে।

কিছু সময় পর দেখা যাবে, এক চামচ পানি যে প্লেটে দেয়া হয়েছিল, সেটা আগে শুকিয়ে গেছে, তারপর শুকিয়েছে যে প্লেটে দুই চামচ পানি ছিল এবং সবশেষে শুকিয়েছে তৃতীয় প্লেটটি, যেটাতে ছিল তিন চামচ পানি। এক্ষেত্রে আবহমণ্ডলের তাপমাত্রায় পানি আপনা থেকেই ধীরে ধীরে বাষ্পে পরিণত হয়েছে—এই প্রক্রিয়াকেই বলে বাষ্পীভবন। এটা হয় শুধু তরল পদার্থের উপরিভাগ থেকেই। অন্য একটি পরীক্ষার দ্বারাও তা প্রমাণ করা যায়।

এ জন্য প্রয়োজন একটি প্লেট একটি গ্লাস এবং মুখখোলা সরু লম্বা একটি বোতল। প্রতিটি পাত্রেই দুই চামচ করে পানি দিয়ে পাশাপাশি রাখতে হবে। প্রত্যেকটিতে সমান পরিমাণ পানি থাকলেও প্রত্যেকটি পাত্র কি একই সঙ্গে শূন্য হবে? না। লক্ষ্য করতে হবে, কোন্ পাত্রটি আগে খালি হচ্ছে। প্রথমে খালি হচ্ছে প্লেটের পানি, তারপর গ্লাসের এবং সবশেষে বোতলের। এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে তরল পদার্থের উপরিভাগের ক্ষেত্রের আয়তন যত বেশি হবে বাষ্পীভবন তত বেশি হবে।

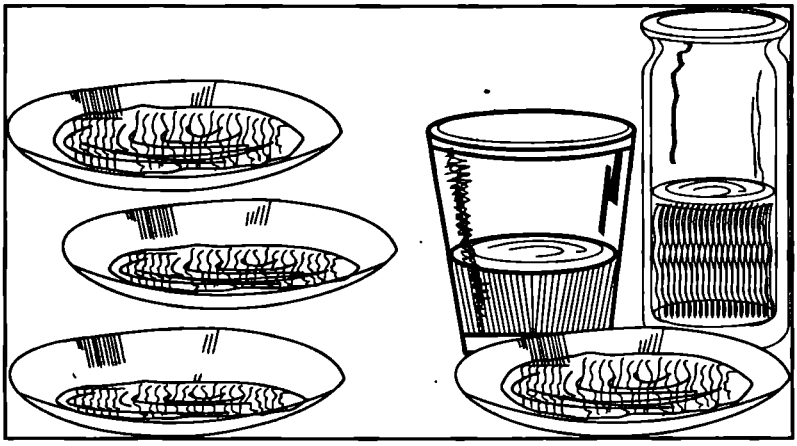

ফলাফল : পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হলো, এই যে প্লেটের পানিগুলো উড়ে বাতাসের জলীয় বাষ্পের সাথে মিশে যাচ্ছে এটাই হলো বাষ্পীভবন।

www.pathagar.com

প রী ক্ষা ১৪

গোসলের পর গায়ে বাতাস লাগলে আমরা ঠাণ্ডা বোধ করি কেন?

কার্যপ্রণালী : এক টুকরো তুলো পানিতে ভিজিয়ে হাতের তালুর উল্টোদিকে ধীরে ধীরে ঘষা হয় তাহলে স্থানটা ভিজে যাবে এবং কয়েক সেকেন্ড বাদেই ওই স্থানটায় ঠাণ্ডা অনুভূত হবে। কেন? কারণ আগেই আমরা বাষ্পীভবনের কথা জেনেছি। তরল পদার্থ তার সংস্পর্শে আসা যে কোনো বস্তু থেকে তাপ সংগ্রহ করে। কাজেই, হাতের ভেজা অংশের বাষ্পীভবন দেহের ওই অংশের তাপে হচ্ছে। ফলে ওই অংশের তাপ কমে যাচ্ছে এবং ঠাণ্ডা অনুভূত হচ্ছে।

এখন পানির বদলে স্পিরিটে ভেজানো সামান্য তুলো হাতে লেপন করলে পার্থক্যটা বোঝা যাবে। পার্থক্যটা হলো, তুমি ওই স্থানে আরো বেশি ঠাণ্ডা অনুভব করবে। কারণ পানির চেয়ে স্পিরিটের বাষ্পীভবন বেশি তাড়াতাড়ি হয়,

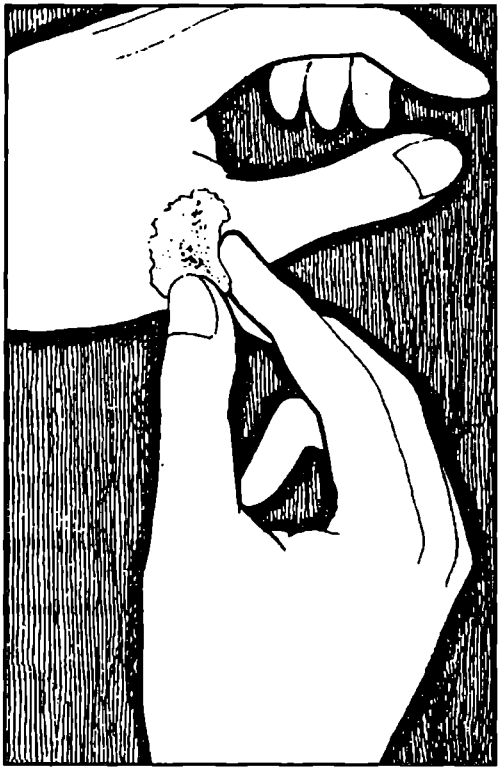

যার জন্য তাপও তাড়াতাড়ি দরকার হয়। ফলে ওই স্থানে আগের তুলনায় বেশি ঠাণ্ডা অনুভূত হয়।

এখন নিশ্চয় বোঝা যাচ্ছে, গোসলের পর আমরা ঠাণ্ডা অনুভব করি কেন। ভেজা দেহে স্বাভাবিক নিয়মে বাষ্পীভবন হয়। কিন্তু বাতাসের সংস্পর্শে এলে বাষ্পীভবনের গতি দ্রুততর হয়, যার ফলে দেহের উপরিভাগের তাপমাত্রা হ্রাস পায় এবং আমারা ঠাণ্ডা অনুভব করি।

ফলাফল : বাষ্পীভবনের কারণেই গোসলের পর আমরা ঠাণ্ডা অনুভব করি।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ১৫

বাষ্পীভবনের ওপর প্রচণ্ড বাতাস এবং তাপের প্রতিক্রিয়া কি?

উপকরণ : এক টুকরো কাপড়, একটা শ্লেট।

কার্যপ্রণালী : বাষ্পীভবনের ওপর প্রচণ্ড বাতাসের প্রতিক্রিয়া দেখতে একটা ছোট পরীক্ষার প্রয়োজন। ভেজা কাপড় দিয়ে শ্লেটের উভয় দিকটা মুছে নাও। এখন শ্লেটের একটা দিকে জোরে জোরে ফুঁ দাও অথবা ফ্যানের বাতাসেও রাখা যেতে পারে।

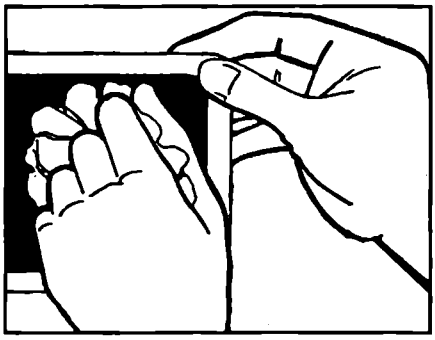

এবার বল, কোন দিকটা আগে শুকাবে? যে দিকটায় বাতাস লাগবে সে দিকটা, না তার অপর দিকটা? হ্যাঁ, যে দিকটায় বাতাস লাগছে, সে-দিকটাই প্রথমে শুকাবে।

দমকা হাওয়ায় পানির কণাগুলো উবে যায়। পানির কণা বা মলিকিউলগুলি উবে গেলে পরের মলিকিউলের উবে যাওয়ার পথও খুলে যায়।

অন্যদিকে বাষ্পীভবনের ওপর তাপের প্রভাব পরীক্ষা করার জন্য দরকার সমআয়তনের দুটি তোয়ালে। দুটি তোয়ালেই পানিতে ভিজিয়ে দাও, যাতে প্রায় সমপরিমাণ পানি শোষণ করতে পারে। এরপর একটা শুকোতে দাও রোদে এবং অপরটা ছায়ায়। পরীক্ষাটা এমন দিনে করবে, যখন জোরে বাতাস বইবে না। এখন দেখ, কোন্ তোয়ালে প্রথমে শুকায়।

অবশ্যই রোদে রাখা তোয়ালে প্রথমে শুকিয়ে যাবে। ঠাণ্ডা বাতাসের তুলনায় গরম বাতাসে পানির কণাগুলো দ্রুত অপসৃত হয়। কারণ গরম বাতাসের মলিকিউলস্, ঠাণ্ডা বাতাসের চেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন।

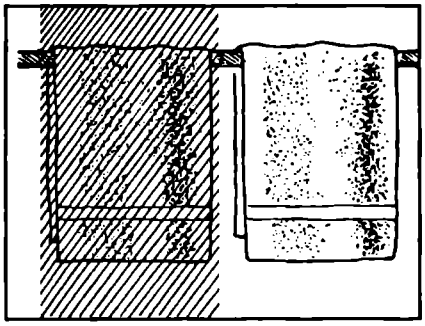

ফলাফল : বাষ্পীভবনের ওপর বাতাসের এবং তাপের দুটোরই প্রভাব রয়েছে।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ১৬

গ্লাসে ঠাণ্ডা পানি বা কোলড্রিংস ঢালার পর গ্লাসের গায়ে বিন্দু বিন্দু পানি জমে? যতই সাবধানে ঢালো না কেন পানি জমবেই। কারণ কি?

উপকরণ : অর্ধেক পানিতে ভর্তি একটা কাচের গ্লাস, কয়েক টুকরো বরফ।

কার্যপ্রণালী : পানি ভর্তি কাচের গ্লাসে বরফের টুকরোগুলো ছেড়ে দাও। কিছুক্ষণ পর বরফ গলে যাবে এবং পানি ও গ্লাস ঠাণ্ডা হতে থাকবে।

এবার কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে দেখা যাবে, গ্লাসের বাইরে বিন্দু বিন্দু পানি জমেছে। কোথা থেকে এই পানি এসে গ্লাসের বাইরের গায়ে জমা হচ্ছে? শুধু তাই নয়, দেখবে বাইরের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ যত উষ্ণতর হবে, গ্লাসের গায়ে পানি জমবে তত দ্রুত এবং তা সংখ্যায় বেশি হবে।

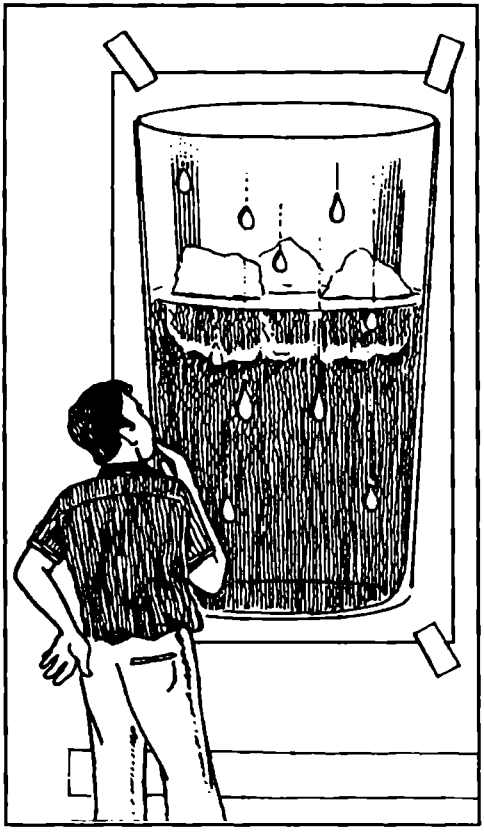

আগের পরীক্ষায় দেখেছ, বাষ্পীভবন কিভাবে হয়। উন্মুক্ত সব পানির উপরিভাগের বাষ্পীভবন একই প্রক্রিয়ায় হয়। পানি বাষ্পে পরিণত হয়ে আবহমণ্ডলের সাথে মিশে যায়। কিন্তু ঠাণ্ডার সংস্পর্শে এলে আবার তা তরলে পরিণত হয়—এক্ষেত্রে যেমন পানির কণা। এই প্রক্রিয়াকে বলে ঘণীভবন।

ফলাফল : তাপমাত্রা বাড়লে, বাষ্পীভবন দ্রুত হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মাধ্যমে যত ঠাণ্ডা হবে, ঘণীভবন তত দ্রুত হবে।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ১৭

বর্ষার সময় আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টি হয়, কখনও কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। কোথা থেকে এত বৃষ্টি আসে?

উপকরণ : একটা অ্যালুমিনিয়ামের কেটলি, একটা হাতাওয়ালা প্যান বা কড়াই, কয়েক টুকরো বরফ অথবা ঠাণ্ডা পানি।

কার্যপ্রণালী : অ্যালুমিনিয়ামের কেটলিতে পানি ফোটাতে হবে। বাষ্প নির্গত না হওয়া পর্যন্ত পানি ফোটাতে হবে। এবার হাতাওয়ালা প্যানে কিছু বরফের টুকরো বা ঠাণ্ডা পানি নাও।

এখন বুঝতে পারবে বৃষ্টির পানি আসে কোথা থেকে। এবার কেটিলির যে মুখ থেকে বাষ্প বেরোচ্ছে, তার একটু দূরে ধর বরফ ভর্তি ওই প্যান। প্রচুর বাষ্প প্যানের শীতল গায়ে আঘাত খেয়ে পুনরায় পানিকণায় পরিণত হবে, অর্থাৎ ঘনীভবন প্রক্রিয়া শুরু হবে। এভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানির বিন্দু একত্রিত হয়ে যখন বড় ফোঁটায় পরিণত হয়, তখন নিজের ভারেই তা ঝরে পড়ে। এই প্রক্রিয়াতেই বৃষ্টি হয়।

সূর্যের তাপে নদী, সাগর,হ্রদ ও পুকুরের পানি বাষ্পাকারে আবহমণ্ডলে মিশে যায়। বাতাস যখন ওপরের দিকে ওঠে তখন তা ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং বাতাসে সঞ্চিত বাষ্প উর্ধ্বাকাশের শীতল আবহাওয়ার সংস্পর্শে পানির কণায় পরিণত হয়ে মেঘের সঞ্চার করে। পানির বিন্দুগুলি যখন বেশি ভারি হয়, তখন নিজের ভারেই বৃষ্টি হয়ে অঝোরে পৃথিবীতে ঝরে পড়ে।

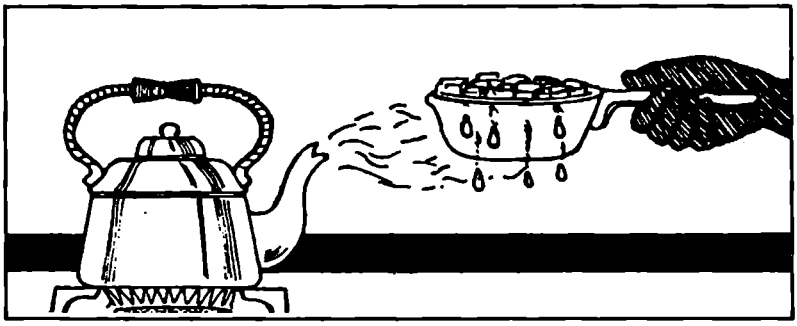

ফলাফল : বর্ষাকালে সূর্যের তাপে নদী, সাগর, খাল-বিলের পানি বাষ্পাকারে আবহমণ্ডলে মিশে গিয়ে মেঘ সৃষ্টি হয়। মেঘ হচ্ছে ছোট ছোট পানির কণা। অনেকগুলো পানির কণা একসাথে হলে পানির কণা ভারি হয়ে যায় এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা অঝোরে বৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ১৮

শীত প্রধান অঞ্চলে নদী, সাগর ইত্যাদি জমে বরফ হয়ে যায়। এই বরফের ওপরে মানুষ এক বিশেষ ধরনের জুতা, যাকে বলে আইস স্কেটস, পরে স্কেটিং খেলে। আইস স্কেটিং কীভাবে খেলা যায়?

উপকরণ : লম্বা একটা ধাতু নির্মিত তার, দুটো পেনসিল।

কার্যপ্রণালী : ধাতু নির্মিত তারের উভয় প্রান্তেই একটি করে পেন্সিল বাঁধ। পেন্সিল দুটি তারকে আঁটো করে রাখতে হ্যান্ডেলের মতো কাজ করবে। এখন একটি ছোট কাঠের তক্তার ওপর বড় একখণ্ড বরফ এমনভাবে রাখ যাতে পেন্সিল দুটি তক্তার উভয় দিকে ঝুলন্ত থাকে। এবার দু'হাত দিয়ে দু'দিকের পেন্সিল ধরে ধীরে ধীরে নিচের দিকে টানতে থাক। কী ঘটছে।

দেখা যাবে, তার বরফ কেটে নিচের দিকে নামতে থাকবে এবং বরফ ভেদ করে শেষ পর্যন্ত গোড়া পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বরফ দু'টুকরো হবে না। তারের ঘর্ষণজনিত তাপে বরফ গলে যাবে, তার ভেতরের দিকে প্রবেশ করবে, কিন্তু পরমুহূর্তে কাটা অংশ আবার জমে বরফ হয়ে যাবে।

আসল কাজটা বোঝা গেছে নিশ্চয়। হ্যাঁ, তারের চাপে তাপ উৎপন্ন হচ্ছে এবং সেই তাপে বরফ গলছে। চাপ সরে যেতে তাপও অপসারিত হচ্ছে। ফলে বরফের বিভক্ত অংশ জোড়া লেগে যাচ্ছে। আইস-স্কেটিং গেমসে, খেলোয়াড়ের দেহের সমগ্র ওজন কেন্দ্রীভূত থাকে, তার পায়ে বাঁধা বিশেষ ধরনের জুতোর নিচের লৌহখণ্ডের ওপর। দেহের ভারজনিত চাপে লৌহখণ্ড বরফের ওপর উৎপন্ন করে তাপ এবং সেই তাপে বরফ গলে। গলা বরফ থেকে তৈরি হয় পানি। সেই পানিতে বরফের বুক হয় পিচ্ছিল যা স্কেটারকে গড়িয়ে যেতে সাহায্য করে।

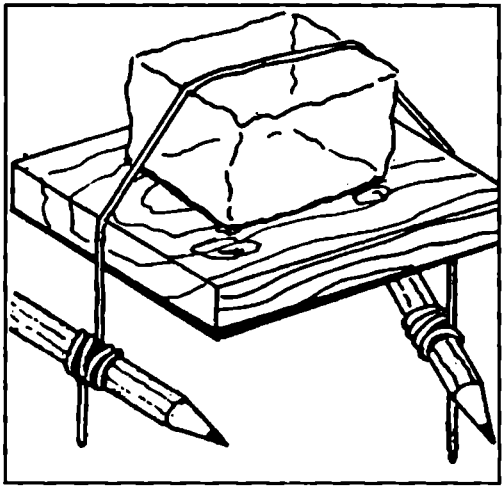

ফলাফল : উপরের পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হলো, বরফের ভেতর কীভাবে আইস স্কেটিং খেলা যায়।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ১৯

কিছু কিছু কীট-পতঙ্গ খুব স্বাচ্ছন্দ্যে পানির ওপর চলাফেরা করে। পানির মতো তরল পদার্থের ওপর কিভাবে তা সম্ভব হচ্ছে?

উপকরণ : পানি ভর্তি একটা বড় পাত্র, এক টুকরো টিসু পেপার, একটা সুঁচ।

কার্যপ্রণালী : টেবিলের ওপর পানি ভর্তি বড় পাত্রের পানি স্থির হলে, খুব সাবধানে পানির ওপর সমান্তরালভাবে একটা সুঁচ রাখ। যদি ঠিকমতো রাখতে পার, তাহলে দেখে অবাক হবে যে সুঁচ পানিতে ভেসে আছে। যদি ডুবে যায়, তাহলে নিরাশ না হয়ে আবার চেষ্টা কর। সফল হবেই।

এবার অন্য একটা পরীক্ষা করে দেখা যাক, এক টুকরো টিসু পেপার পানির ওপর রেখে তার ওপর সুঁচটি রাখতে হবে। পানিতে ভিজে টিসুপেপার কিছুক্ষণ পর ডুবে যাবে কিন্তু সুঁচ ভেসে থাকবে। কারণ কি? আসলে, পানির ওপরটায় একটা মিহি আস্তরণ থাকে, যাকে বলে 'সারফেস্ টেন্‌শন' বা উপরিভাগের টান। পানির উপরিভাগের মলিকিউলগুলি নিচের মলিকিউলের তুলনায় আরো ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এভাবে পানির উপরিভাগের মলিকিউলগুলির মধ্যে তীব্র আকর্ষণ শক্তি সুঁচটিকে ভেসে থাকতে সাহায্য করে। এই তীব্র আকর্ষণ শক্তি পানির ওপর তৈরি করে এক ধরনের আস্তরণ, যা প্লাটফর্মের মতো কাজ করে। আর এরই ওপর দিয়ে ছোট ছোট কীট-পতঙ্গ স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করে।

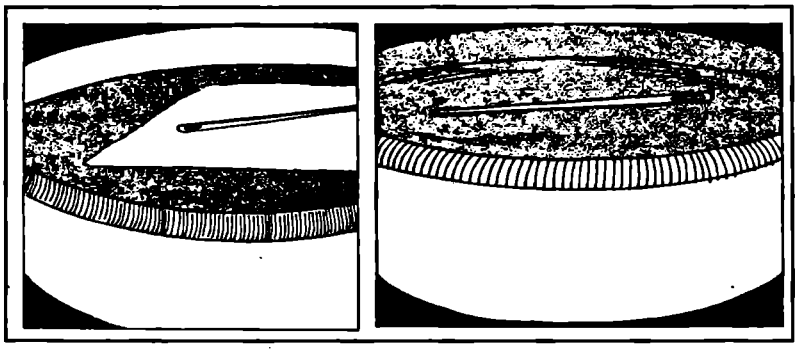

ফলাফল : পানির উপরিভাগে যে আস্তরণ ও উপরিভাগের যে টান থাকে তার উপর ভর করে অনেক জলজ কীট-পতঙ্গ খুব স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করতে পারে।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ২০ এক গ্লাস পানিতে একটি প্লাস্টিক বা কাচের টিউব রাখলে টিউবের পানির মাত্রা গ্লাসের পানির মাত্রার চেয়ে উপরে থাকে—কেন?

উপকরণ : পানি ভরতি একটা কাচের গ্লাস, ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসের তিন-চারটি কাচের টিউব।

কার্যপ্রণালী : পানি ভরতি গ্লাসে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসের তিন-চারটি টিউব রাখতে হবে। কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসের টিউবে পানির মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন রকম, অথচ গ্লাসের পানি আছে স্থির। যে টিউবের ব্যাস সব থেকে ছোট, সেই টিউবের পানির মাত্রা সবথেকে ওপরে এবং যে টিউবের ব্যাস সব থেকে বড় সেই টিউবের পানির মাত্রা সবথেকে নিচে। কেন এমনটা হয়? নিচের পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তর পাওয়া যাবে।

একটা টেস্টটিউবের অথবা লম্বা, সরু ও গোলাকার বোতল নিয়ে অর্ধেকটা ভর্তি কর পানিতে। এবার মনোযোগ দিয়ে পানির মাত্রা লক্ষ্য কর। পাশের দিকে পানির লেবেল ওপরে কিন্তু মাঝখানটার লেবেল হয়েছে অবতল বা ধনুতের মতো বাঁকা। পানির এই বাঁকা রেখাকে বলে মেনিসকাস। আসঞ্জন ধর্মের (লেগে থাকা) দরুন টিউব বা বোতলের দেয়ালে পানির কিছু অংশের ওপর যে আকর্ষণ শক্তি প্রয়োগ করে তার ফলেই ধনুকের মতো এই রেখা সৃষ্টি হয়।

সাধারণভাবে তুমি মনে করতে পার, এই আসঞ্জন শক্তির ফলেই টিউবের পার্শ্বদেশে পানির মাত্রা উর্ধ্বমুখী হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পানির মাত্রা উর্ধ্বমুখী হওয়ার এই ক্রিয়াকে বলে 'ক্যাপিলারি অ্যাকশন' কৈশিক প্রভাব। কম ব্যাসের টিউবের কৈশিক ক্ষমতা সব থেকে বেশি, কারণ কম ব্যাসের টিউবে পানির বৃহত্তর অংশ টিউবের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে থাকে, যার ফলে আকর্ষণ শক্তির প্রভাব বেশি হয়।

এখন দেখা যাক, পানিতে ভর্তি করার আগে টিউবের ভেতরের দিকে গ্রিস মাখালে কী হয়। এবার দেখা যাবে পানির মাত্রা ধনুকের মতো নিচের দিকে না বেঁকে, ওপর দিকে ফুলে উঠেছে। কেন? এর কারণ হলো, প্লাস্টিক বা গ্লাসের মতো গ্রিস অত জোরে পানির মলিকিউলগুলো আকর্ষণ করতে পারছে না। এক্ষেত্রে, পানির মলিকিউলগুলোর পারস্পরিক আকর্ষণ গ্রিসের চেয়ে বেশি, যাকে বলা হয় 'কোহিজন' (যে শক্তি বলে অনুগুলো পরস্পর একত্রিত থাকে)। 'অ্যাডিজন' নয়।

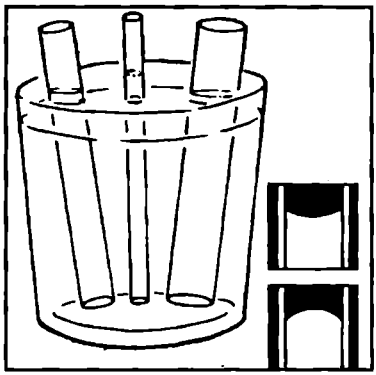

ফলাফল : অতএব, প্রমাণিত হলো ক্যাপিলারি অ্যাকশন বা কৈশিক প্রভাবের ফলে গ্লাসের ভেতর রাখা ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসের টিউবের পানির মাত্রা গ্লাসের পানির মাত্রা থেকে ওপরে থাকবে।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ২১

সরাসরি আলোর নিচে রাখা পানিতে কয়েক ফোঁটা দুধ ফেললে তা উজ্জ্বল চকচকে হয়ে ওঠে কেন?

উপকরণ : বড় মুখের একটি বোতল বা কাচের জার, টর্চ লাইট, পানি ও দুধ।

কার্যপ্রণালী : প্রথমে বোতল বা কাচের জারে পানি ভর্তি করতে হবে। এবার টর্চ লাইটের আলো তার ওপর এমনভাবে ফেলতে হবে, যাতে আলো সরাসরি পানির ওপর পড়ে, বোতল বা জারে নয়। এখন যদি ওপর থেকে দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে পানি চকচক করছে, কিন্তু বোতলের বাইরের দিকটা দেখা যাবে আগের চেয়ে অনেক বেশি অন্ধকার।

এবার সেই পানিতে মেশাতে হবে ২-৩ চামচ দুধ। ভালো করে চামচ দিয়ে নেড়ে দিতে হবে। এখন তার ওপর আলো ফেললে দেখা যাবে অনেক তফাৎ। বোতলের ভেতরকার উজ্জ্বলতা বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু বোতলের বাইরের দিকের উজ্জ্বলতা বেড়েছে অনেক গুণ বেশি—ঠিক যেন এক দুধেলা বাল্‌বের মতো দেখাচ্ছে। যা ঘটছে তা হলো, টর্চের আলো ফেললে, আলোর আপতন কোণ এত তীব্র হয় যে, সম্পূর্ণ প্রতিফলন, নিয়মানুসারে সমগ্র আলো জারের ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু পানির সঙ্গে যখন একটু দুধ মিশিয়ে দেওয়া হয়, তখন অবস্থার আমূল রূপান্তর ঘটে। টর্চের আলো, পানির ওপর ভাসমান দুধের মলিকিউলসের ওপর পড়তেই তা প্রতিফলিত হয়। প্রতিফলিত আলো বোতলের স্বচ্ছ দেয়াল ভেদ করে ভেতরের উজ্জ্বলতা বাইরে নিয়ে আসে।

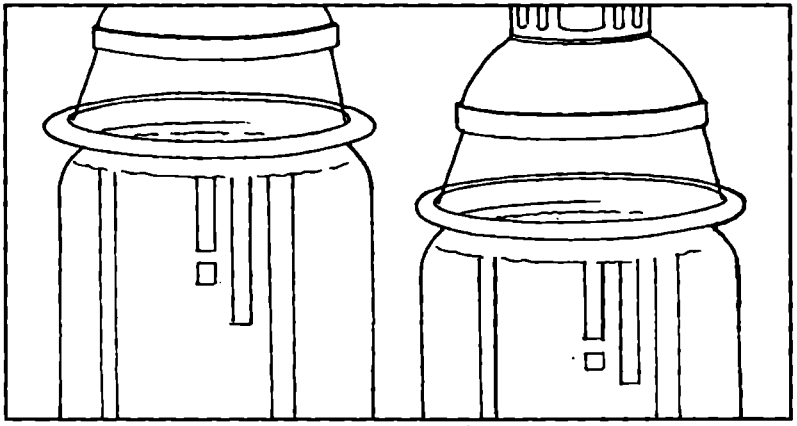

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে এখন একেবারে স্পষ্ট যে, সরাসরি আলোর নিচে রাখা পানিতে কয়েক ফোঁটা দুধ ফেললে তা উজ্জ্বল ও চকচকে হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ২২

স্বচ্ছতা ও অস্বচ্ছতার মাঝের অবস্থা হচ্ছে ঈষদচ্ছ, অর্থাৎ আলোকরশ্মি দ্বারা ভেদ্য হলেও স্বচ্ছ নয়। দ্রবনীয়তা ও অ-দ্রবনীয়তার মধ্যেও কি এমন অবস্থা আছে?

উপকরণ : মোটা কাগজ, টর্চ লাইট, দুটি কাচের বোতল, পানি, চিনি ও দুধ।

কার্যপ্রণালী : মোটা কাগজটি মোচাকারে ভাঁজ করে এর ছুঁচালো মাথাটা সামান্য কেটে দিতে হবে। এবার মোচাকৃতি কাগজের খোলটি টর্চ বা আলোর সামনে আঠা দিয়ে আটকে দাও। রঙহীন দুটি কাচের বোতলে পানি ভর্তি করে একটিতে কয়েক চামচ চিনি এবং অন্যটিতে কয়েক চামচ দুধ দিতে হবে। চিনি পানিতে গুলে যাবার পর, এক এক করে উভয় বোতলেই টর্চের আলো ফেল। দেখা যাবে, যে বোতলে চিনি দেয়া ছিল, আলো সেই বোতলে কোনোক্রমে অতিক্রম করছে। কিন্তু যে বোতলে দুধ দেয়া ছিল সেটা খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, কারণ দুধ পানির সঙ্গে কলয়ডাল মিশ্রণ (আঠার মিশ্রণ) সৃষ্টি করেছে।

যখন কোনো পদার্থ পানি বা কোনো তরল পদার্থের সঙ্গে মেশে, তখন সমগ্র পদার্থ বা তার অংশবিশেষ তরল পদার্থে গলে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই ধর্মকে বলে তরল পদার্থের দ্রবনীয়তা। যদি তা না গলে, তাহলে তাকে বলা হয় অ-দ্রবনীয়তা সেক্ষেত্রে সেই পদার্থ তরল পদার্থের তলানী হিসেবে জমা হয়। এই দুই অবস্থা ছাড়া আরো একটা অবস্থা আছে, যাকে বলা হয় কলয়ডাল সাসপেনসন, অর্থাৎ যা গলে না এবং নিচেও জমা হয় না। এর মলিকিউলস ঝুলে থাকে। এসব মলিকিউল বড় বলে তাতে আলো প্রতিফলিত হয়ে তা দেখা যায়। এখন নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ, দুধ মেশানো পানি কেন চকচকে উজ্জ্বল হয়, যখন তার মধ্যে দিয়ে আলো অতিক্রম করানো হয়।

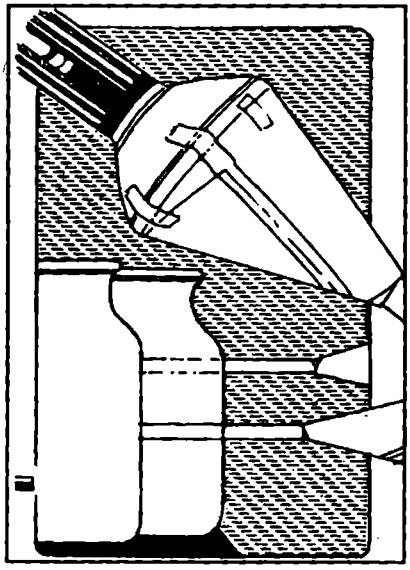

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, দ্রবনীয় ও অ-দ্রবনীয় অবস্থা ছাড়াও একটা অবস্থা আছে, যাকে বলে কলয়ডাল সাসপেনশন, অর্থাৎ যা গলে না এবং পাত্রের নিচেও জমা হয় না। এর মলিকিউলস্‌গুলো ঝুলে থাকে।

www.pathagar.com

প রী ক্ষা ২৩

সার্কাসে 'মরণ ফাঁদ' নামে একটা মোটর সাইকেলের খেলা দেখানো হয়। চালক গোলাকার খাঁচার ভেতরে খুব দ্রুতগতিতে মোটর সাইকেল চালায় কিন্তু পড়ে যায় না, এমন কি খাড়াখাড়ি চালানো সত্ত্বেও পড়ে যায় না—কেন?

উপকরণ : একটা ছোট বালতি, পানি, রসি বা দড়ি একটা শক্ত টুল।

কার্যপ্রণালী : ছোট বালতির এক-তৃতীয়াংশ পানি ভর্তি করে তার হাতলে আধা মিটার লম্বা দড়ি বাঁধতে হবে। এবার খোলা জায়গায়, কাঠের টুলের উপর দাঁড়িয়ে বালতির হাতলের দড়ি ধরে খুব জোরে চক্রাকারে ঘোরাতে থাক। ঘোরানোর সময় দেখবে যাতে বালতির মুখের দিকটা তোমার হাতের দিকে থাকে এবং পেছন দিকটা থাকে বৃত্তের বাইরের দিকে। ঘোরাতে-ঘোরাতে এমন একটা অবস্থা আসবে, যখন বালতির মুখ থাকবে খাড়াভাবে তোমার দিকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বালতির পানি পড়বে না। যে শক্তি বালতির পানি পড়তে দিচ্ছে না, সেটাকে বলে কেন্দ্রমুখি বা অপকেন্দ্র বল বলে। অপকেন্দ্র বলের প্রধান ধর্ম হলো, চক্রাকার পথে আবর্তিতত তীব্র গতিশীল কোনো বস্তু এবং বৃত্তাকার-আবর্তনের কেন্দ্রের মধ্যে গতি যত বেশি হবে, অপকেন্দ্র বলও তত বাড়বে।

এই অপকেন্দ্র বলের দরুণ, মোটরসাইকেল চালক, খাঁচার ভেতরে চালাবার সময় মোটর সাইকেলসহ নিজে পড়ে যায় না।

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, সেন্ট্রিফিউগল ফোর্স বা অপকেন্দ্র বলের দরুণ বালতির পানি পড়ে যায় না আর সার্কাসের খেলায় গোলাকার কিংবা খাড়াখাড়ি চালালেও মোটরসাইকেল চালকও পড়ে যায় না।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ২৪

দ্রুতগামী বাস বা গাড়ির গতি হঠাৎ কমলে বা থামলে ভেতরে বসা ব্যক্তি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে—কেন?

উপকরণ : শুধুমাত্র কয়েকটা বই লাগবে এ পরীক্ষার জন্য।

কার্যপ্রণালী : হাতের ওপর প্রসারিত করে তার ওপর ৬-৭টি বই রাখ, একটার ওপর একটা। এবার কিছুটা সামনে হাত বাড়িয়ে দ্রুত হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়। কি হচ্ছে? হাতের উপর রাখা বই থেকে কয়েকটা বই মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। এ পরীক্ষা তুমি যতবার করবে ততবারই একই ফল হবে।

অন্যদিকে চলন্ত বাস বা গাড়ি হঠাৎ ব্রেক কষলে বা গাড়ি থামালে ভেতরে বসা যাত্রীর ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। এখানে 'ল অব ইন্যার্সিয়া' কার্যকর। এই নিয়ম অনুসারে, কোনো পদার্থ বাধা না পেলে জড়তার নিয়মানুষারে বিদ্যমান থাকে, বা এক দিশায় চলতে থাকে।

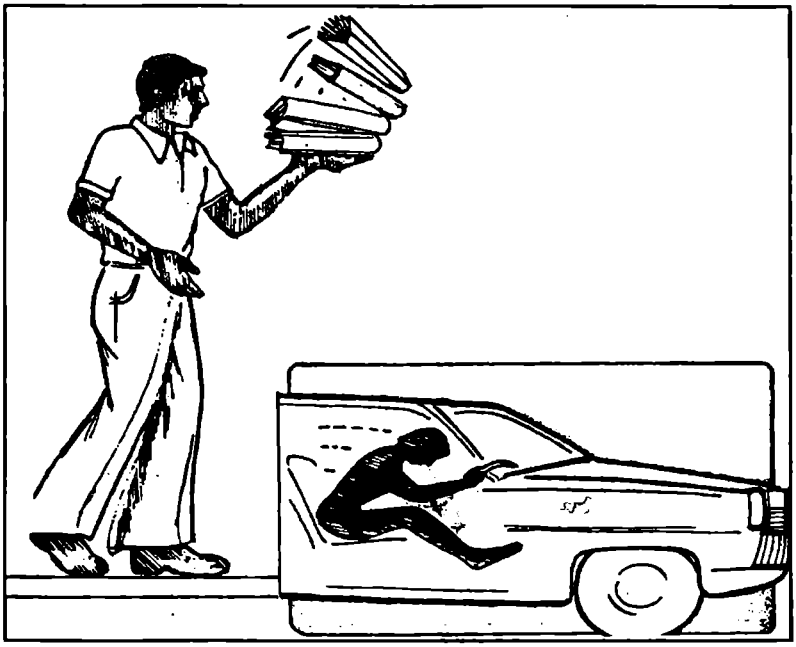

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, 'ল অব ইন্যার্সিয়া' শক্তির কারণে চলন্ত বাস বা গাড়ি হঠাৎ ব্রেক কষলে ভেতরের যাত্রীরা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অনেক সময় দুর্ঘটনাও ঘটে থাকে।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ২৫

থেমে থাকা বাস বা গাড়ি হঠাৎ চলতে শুরু করলে ভেতরে বসা ব্যক্তি পেছনের দিকে হেলে পড়ে—কেন?

উপকরণ : একটা কাচের গ্লাস, একখণ্ড পিচবোর্ড, একটা এক টাকার কয়েন।

কার্যপ্রণালী : কাচের গ্লাসের ওপর একখণ্ড পিচবোর্ড রাখ এবং তার ওপরে রাখতে হবে একটা কয়েন। আঙুল দিয়ে পিচবোর্ডের খণ্ডটি ফেলে দাও, দেখবে পিচবোর্ডের সঙ্গে কয়েনটিও মাটিতে পড়ে গেছে। কয়েনসহ পিচবোর্ডটি আবার গ্লাসের ওপর রাখ। এবার তর্জনী ও বুড়ো আঙুলের সাহায্যে পিচবোর্ডের কিনারায় খুব জোরে টোকা মার। এ ক্ষেত্রে কিন্তু ফল অন্যরকম হবে। জোরে টোকা মারার সঙ্গে সঙ্গে পিচবোর্ড ছিটকে গ্লাসের বাইরে পড়েছে, কিন্তু কয়েনটি পড়েছে গ্লাসের ভেতর।

আসল ব্যাপার হলো, সজোরে টোকা মারার কারণে পিচবোর্ডের টুকরো যে গতিতে ছিটকে গেছে, তার ওপর রাখা মুদ্রাটি সেই গতিতে যেতে পারেনি এবং পিচবোর্ডের গতির সঙ্গে যেতে পারার পেছনে কাজ করেছে 'ল অব ইন্যার্সিয়া'। নিশ্চল কোনো বস্তু সেই অবস্থাতেই থাকবে, যতক্ষণ না বাইরের কোনো শক্তি তাকে চালিত করছে।

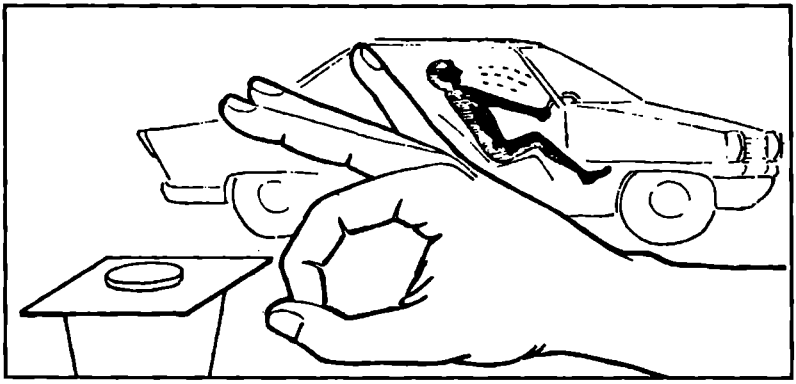

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, 'ল অব ইন্যার্সিয়া' শক্তির কারণে এখানেও চলন্ত বাস বা গাড়ি হঠাৎ দ্রুতগতিতে চলতে শুরু করলে ভেতরের যাত্রীরা পেছন দিকে ঝুঁকে পড়ে। এ ক্ষেত্রে অনেক সময় দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে।

www.pathagar.com

প রী ক্ষা ২৬

নদীর পানি যাতে উপচে পড়ে বন্যার সৃষ্টি না করে সেজন্য বাঁধ দেয়া হয় কিন্তু এই বাঁধের নিচের দিকটা ওপরের অংশের তুলনায় অনেক বেশি চওড়া করে দেয়া হয়—কেন?

উপকরণ : একটা সরু লম্বা টিনের পাত্র, হাতুড়ি, পেরেক, পানি।

কার্যপ্রণালী : লম্বা টিনের পাত্রের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত চারটি সমান অংশে ভাগ করে, হাতুড়ি ও পেরেকের সাহায্যে তিনটি ছিদ্র করো। পাত্রটি ট্রে কিংবা এমন জায়গায় রাখ, যাতে পানি পড়ে কোনো কিছু নষ্ট না হয়। এবার টিনের পাত্রটি পানিতে ভর্তি কর।

কি হচ্ছে? দেখা যাচ্ছে তিনটি ছিদ্র দিয়ে পানি তিনটি ধারায় পড়ছে। কিন্তু এও দেখবে যে, তিনটি পানির ধারা সমান দূরত্বে পড়ছে না। নিচের ছিদ্র দিয়ে নির্গত পানি সব থেকে দূরে পড়ছে এবং ওপরের ছিদ্র পথে নির্গত পানি পড়ছে টিনের সব থেকে কাছে! এর কারণ কি? কারণটা হচ্ছে, ওপরের ছিদ্র মুখের ওপরে যে পানি আছে, সেই পানিই কেবল ওপরের ছিদ্রমুখ দিয়ে নির্গত হচ্ছে। যেহেতু নিচের অংশের পানি ওই পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না, সেহেতু ওই ছিদ্রমুখে নিচের পানির অংশে কোনো চাপ পড়ছে না। তেমনি, নিচের ছিদ্রমুখের ওপর পড়ছে ওপরে সমগ্র অংশের পানির চাপ এবং স্বভাবতই ওপরের ছিদ্রমুখ থেকে নিচের ছিদ্রমুখের ওপর চাপ অনেক বেশি হবে। বেশি চাপের দরুণ নিচের ছিদ্রমুখ থেকে নির্গত পানির ধারা দূরে গিয়ে পড়ছে।

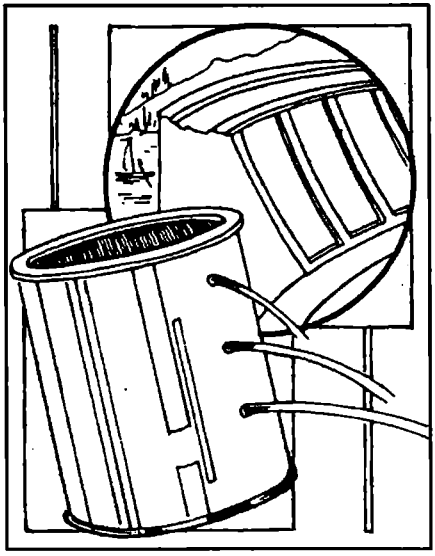

এ কারণে নদীতে নির্মিত বাঁধের তলদেশ অনেক বেশি চওড়া হয়, কারণ তলদেশের ওপর পানির চাপ অনেক বেশি পড়ে।

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, কি কারণে নদীতে যে বাঁধ দেয়া হয় তার উপরের দিকের চেয়ে নিচের অংশটা চওড়া বেশি থাকে।

www.pathagar.com

প রী ক্ষা ২৭

আমরা যে খাদ্য খাই তাতে শর্করা এবং চর্বিজাতীয় উপাদান থাকে, কোন খাদ্যে কোন উপাদান আছে তা নির্ধারণের কি কোনো সহজ উপায় আছে?

উপকরণ : স্টার্চ বা শর্করা, বেকিং পাউডার (সোডিয়াম বাই-কার্বনেট), ড্রপার, টিংচার আয়োডিন। আর চর্বিজাতীয় উপাদান প্রমাণের জন্য প্রয়োজন- এক টুকরো পরিষ্কার কাগজ, লেবুর রস, ঘি বা মাখন।

কার্যপ্রণালী : এক টুকরো কাচের ওপর একটু স্টার্চ বা শর্করা নাও এবং কাচের একটু তফাতে নাও বেকিং পাউডার। এবার ড্রপারের সাহায্যে দুটি উপাদানের ওপর এক ফোঁটা করে টিংচার আয়োডিন ফেলতে হবে। এবার লক্ষ্য করতে হবে রঙের পরিবর্তন। সোডিয়াম বাই-কার্বনেট ধারণ করবে আয়োডিনের রঙ এবং স্টার্চ নেবে বেগুনি-লাল, যার দ্বারা বোঝা যাবে তাতে স্টার্চ আছে।

এখন এক টুকরো আলু আপেল ও পাউরুটি নিয়ে তাতে ফোঁটায় ফোঁটায় টিংচার আয়োডিন ফেলতে হবে। দেখবে, আপেল ছাড়া পাউরুটি ও আলুর রঙ হয়ে বেগুনি-লাল, যার দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে এতে স্টার্চ বা শ্বেতসার আছে।

এবার প্রমাণ করতে হবে খাবারে চর্বির উপাদান। এক টুকরো পরিষ্কার কাগজ নিয়ে পাশাপাশি দুটি বৃত্ত এঁকে, একটি বৃত্তে ফেল কয়েক ফোঁটা লেবুর রস এবং অন্য বৃত্তে ঘি বা মাখন।

১০-১৫ মিনিট পরে দেখবে, যেখানে লেবুর রস ফেলা হয়েছে, সেই অংশটি শুকিয়ে গেছে এবং কাগজের পেছন দিকে তার কোনো দাগ নেই। কিন্তু যে অংশটিতে ঘি বা মাখন রাখা হয়েছিল, সেই অংশের দাগ খুব স্পষ্ট, শুধু সামনের দিকেই নয়, পেছনের দিকেও এবং দাগের পরিধিও বিস্তৃত। এই পরীক্ষায় প্রমাণিত হলো যে, চর্বি জাতীয় পদার্থের ছাপ শুধু যে বিপরীত দিক থেকেই দেখা যায়, তা নয় সেই ছাপ ছড়িয়েও পড়ে। এই পরীক্ষাকে বলে স্পট টেস্ট, ফর ফ্যাটস।

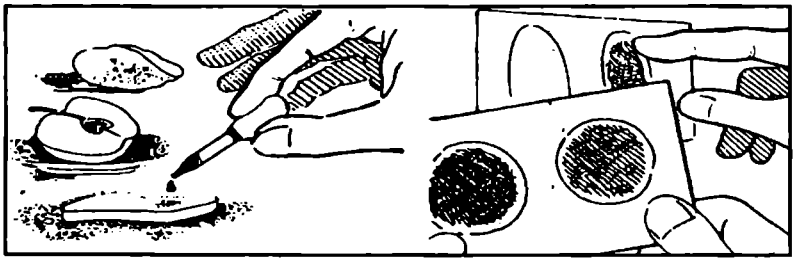

ফলাফল : উপরের দুটি পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, কোন খাবারে শর্করা এবং কোন খাবারে চর্বিজাতীয় উপাদান আছে তা সহজে নির্ধারণ করা যায়।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ২৮

বিজ্ঞানী গ্যালিলিও পিসার হেলানো টাওয়ার থেকে কয়েক টুকরো পাথর ফেলে প্রমাণ করেছিলেন যে, ওজনের তারতম্য সত্ত্বেও সবকটি পাথর একই সঙ্গে ভূমিতে পড়েছে। কিভাবে সম্ভব?

উপকরণ : এক মিটার লম্বা একটা কাঠের তক্তা আর বিভিন্ন ওজনের কিছু কয়েন।

কার্যপ্রণালী : তক্তার লম্বা বরাবর কয়েনগুলো সারিবদ্ধভাবে রেখে তক্তাটি সমান্তরালভাবে দু'হাত দিয়ে ধরে মাথার ওপরে রাখ। তক্তা ও জমির দূরত্ব বাড়াতে তুমি কোনো টুলের উপরও দাঁড়াতে পার। এখন তক্তাটা এমনভাবে কাত করো যাতে কয়েনগুলো একই সঙ্গে গড়িয়ে পড়ে। ফেলার আগে বন্ধুকে বলে রাখ, সে যেন ভালো করে লক্ষ্য করে, সব কয়েন একই সঙ্গে মাটিতে পড়েছে কিনা। কয়েনগুলো যাতে এক সঙ্গে পড়ে, এমনভাবে তুমি যদি তক্তাটি কাত কর, তাহলে দেখবে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে সবকটি কয়েনই একসঙ্গে মাটি স্পর্শ করেছে। মাধ্যাকর্ষণের নিয়মানুযারে সবকিছুই একই গতিতে ভূ-কেন্দ্রাভিমুখী হয়। কিন্তু এই পরীক্ষাই যদি একটি কয়েন এবং একটি পালক বা কাগজ নিয়ে করা হয়, তাহলে ফল অবশ্য অন্য হবে। কয়েন ভূমি স্পর্শ করবে আগে এবং কাগজ বা পালক পরে। কেন? কারণ বাতাস কাগজটিরে পড়ার পথে বাধা সৃষ্টি করছে। কিন্তু কাগজটি যদি কয়েনের ওপর রেখে ফেলা যায়, তাহলে উভয়ই একসঙ্গে মাটিতে পড়বে। যেহেতু বাতাস কাগজটিকে মাটিতে পড়ার পথে সরাসরি কোনো বাধা সৃষ্টি করছে না।

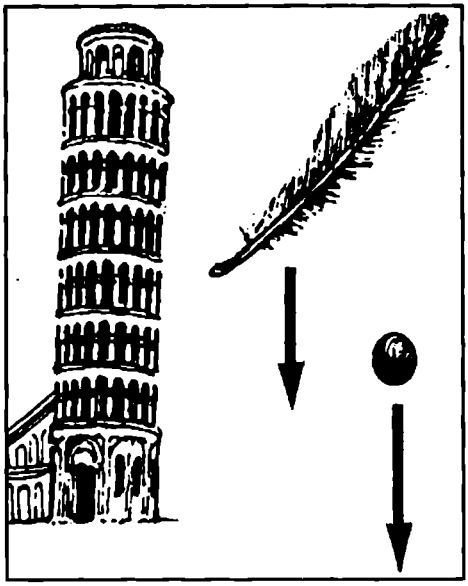

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, প্রখ্যাত ইতালিয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও পিসার হেলানো টাওয়ার থেকে কয়েক টুকরো পাথর ফেলে প্রমাণ করেছিলেন যে, ওজনের তারতম্য সত্ত্বেও সবকটি পাথর একই সঙ্গে ভূমিতে পড়েছে—তা সত্য।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ২৯

হাতে ধরা অবস্থায় টেস্টটিউবের পানি ফোটে—তা কি সম্ভব?

উপকরণ : একটা অগ্নিনিরোধক টেস্টটিউব, মোমবাতি ও পানি।

কার্যপ্রণালী : টেস্টটিউবের ৩/৪ ভাগ পানিতে ভর্তি করে টেস্টটিউবটি একটু কাত করে ধর (ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে) যাতে মোমবাতির শিখায় পানির ওপরের অংশ গরম হয়। কিছুক্ষণ পর পানি ফুটতে শুরু করবে এবং বাষ্পাকারে ওপরের দিকে উঠবে, তা দেখা যাবে।

তুমি টেস্টটিউবটি ধরে আছ, টেস্ট টিউবের পানি ফুটছে, অথচ তোমার হাতে মোমবাতির আগুনের আঁচ লাগছে না। অদ্ভুত মনে হতে পারে। কিন্তু যদি টেস্টটিউবের নিচের দিকের পানি গরম করতে শুরু কর, তাহলে কিন্তু ওপরের দিকটা হাতে ধরে রাখতে পারবে না। তা গরম হয়ে উঠবে। কেন?

যদি নিচের দিক থেকে তা গরম হতে শুরু হয়, তাহলে তুমি টেস্টটিউবের কোনো অংশই ধরে রাখতে পারবে না, কারণ গরম হলে পানি হাল্কা হয়ে ওপরের দিকে ওঠে এবং নিচের ঠাণ্ডা পানি ফুটন্ত না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে। গরম পানির সংস্পর্শে টিউবের পার্শ্বদেশও গরম হয়ে ওঠে। কাজেই সে অবস্থায় টেস্টটিউব ধরে রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু ওপরের দিক থেকে পানি গরম করতে থাকলে তা হবে না। ওপরের উত্তপ্ত পানি নিচের দিকে নামার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ ওপরের গরম পানি হাল্কা। বরং উত্তপ্ত পানি, বাষ্প হয়ে ওপরে উঠতে থাকবে এবং নিচের পানি উত্তাপের কোনো প্রভাব পড়বে না, যার জন্য তোমার পক্ষে টেস্টটিউবের নিচের অংশ ধরে রাখা মোটেই অসম্ভব হবে না।

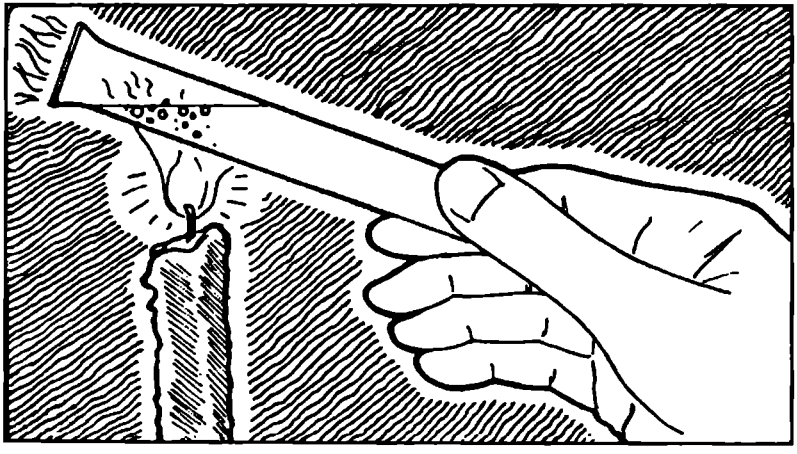

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, টেস্টটিউবের একদিকে কাত করে পানি হাতে ধরে রেখেও পানি ফুটানো সম্ভব।

www.pathagar.com

প রী ক্ষা ৩০

পানির উপর উত্তাপের প্রভাব আছে—প্রমাণ কর?

উপকরণ : ছিপিসহ একটা ফ্লাস্ক, কাচের ফানেল, গ্রিজ, পানি, কালি বা রঙ, মোমবাতি বা বুনসেন বার্নার।

কার্যপ্রণালী : প্রথমে ফ্লাস্কের ছিপির ভেতর গর্ত করে কাচের নলটি তার ভেতর দিয়ে প্রবেশ করাতে হবে। ছিপির যেখান দিয়ে নলটি প্রবেশ করানো হয়েছে, সেই জোড় মুখ যাতে এয়ারটাইট থাকে, তার জন্য গ্রিজ, অথবা গালা দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। এবার নলসহ কর্কটি ফ্লাস্কের মুখে বেশ শক্ত করে বসাও। পানিতে দু-এক ফোঁটা কালি বা তরল রঙ মেশাও। এতে পানির মাত্রা লক্ষ্য করতে সুবিধা হবে। ফ্লাস্কের পানিতে নলটি যে পর্যন্ত ডুবে আছে সেখানে একটি চিহ্ন দাও।

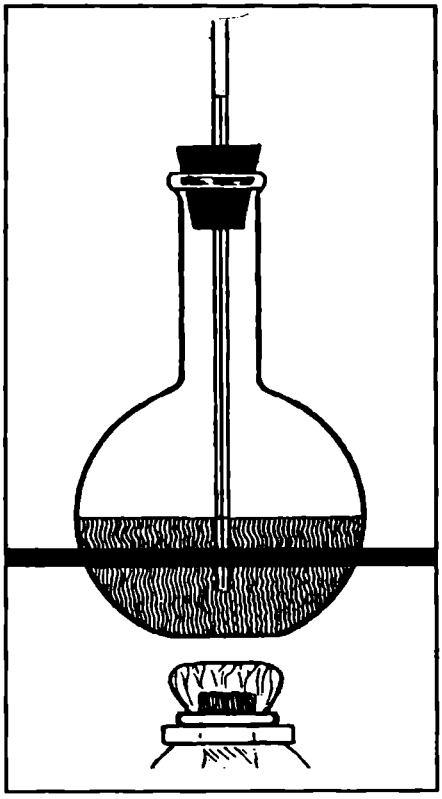

এখন ফ্লাস্কের নিচে মোমবাতির অথবা বুনসেন বার্নারের শিখার আগুনে ধীরে ধীরে পানি গরম করতে হবে এবং দৃষ্টি রাখতে হবে পানির সমতল রেখার দিকে। দেখা যাবে পানির সমতল রেখায় পরিবর্তন এসেছে। কি পরিবর্তন? পানি উত্তপ্ত হতেই পানির মাত্রা উপরের দিকে উঠছে।

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, উত্তাপে পানির আয়তন বাড়ে। পানির অনুগুলি উত্তাপে সম্প্রসারিত হতে চায় এবং যার জন্য দরকার অতিরিক্ত স্থানের। তাই সে ওপরের দিকে ওঠে।

www.pathagar.com

প রী ক্ষা ৩১

পানি গরম করলে তার ওজনের পরিবর্তন হয়—প্রমাণ কর?

উপকরণ : একই রকম দুটি বোতল, গরম পানি, ঠাণ্ডা পানি, কালি বা রঙ এবং এক টুকরো মোটা কাগজ।

কার্যপ্রণালী : খুব সহজেই প্রমাণ করা যায় যে গরম পানির তুলনায় ঠাণ্ডা পানি ভারী হয়। অর্থাৎ, পানি উত্তপ্ত হলে হালকা হয়।

প্রথমে একই রকম দুটি বোতল নিতে হবে। একটি গরম পানি ভরা, অন্যটিতে ঠাণ্ডা পানি। রঙ করার জন্য গরম পানি দু-এক ফোঁটা কালি বা তরল রঙ মেশাতে হবে।

এখন ঠাণ্ডা পানির বোতলের মুখে রাখতে হবে এক টুকরো মোটা কাগজ। কাগজটি বোতলের মুকে আঙুল দিয়ে বোতল শুদ্ধ উপুড় করে অন্য বোতলের মুখে স্থাপন করতে হবে। দুটি বোতলের মুখ যখন পরস্পরের মুখে ঠিকমতো স্থাপিত হবে, তখন কাগজের টুকরোটি টেনে নিতে হবে।

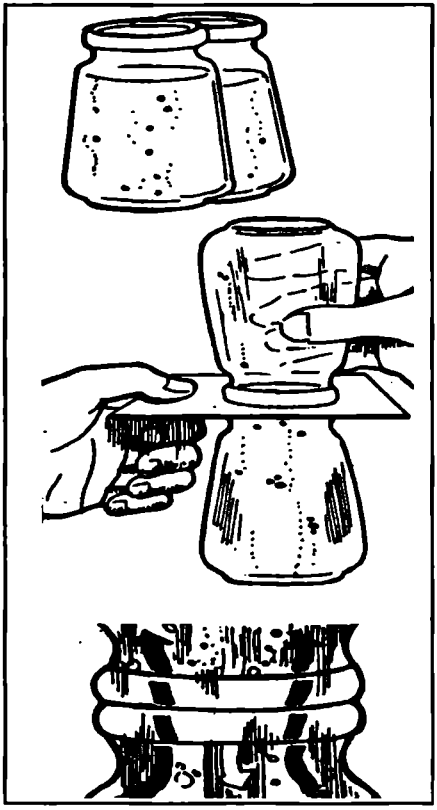

নিচের বোতলের পানি গরম ও রঙিন আর ওপরের বোতলের পানি ঠাণ্ডা। একটু পরে দেখা যাবে, আশ্চর্যজনকভাবে নিচের বোতলের রঙিন পানি ওপরের বোতলের দিকে উঠতে শুরু করেছে। এর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ওপরের বোতলের ঠাণ্ডা পানি ভারী হওয়ার দরুণ নিচের দিকে নামতে চাইছে। তার ধাক্কায় নিচের বোতলের গরম পানি ওপর দিকে উঠছে।

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, পানিকে গরম করলে তার ওজন হালকা হয়ে যায়।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ৩২

শীতকালে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য আমরা উলের জামা-কাপড় পরি—কেন?

উপকরণ : একই রকম দুটি বোতল বা জার, উলের কাপড়, গরম পানি, একটা থার্মোমিটার।

কার্যপ্রণালী : প্রথমে দুটি বোতলেই গরম পানি ভরে দিতে হবে। এরপর একটা বোতল উলের কাপড়ে জড়িয়ে রাখতে হবে। এবার উভয় বোতল ঠাণ্ডা করতে হবে। আধাঘণ্টা বাদে, থার্মোমিটার দিয়ে উভয় বোতলের তাপমাত্রা মাপতে হবে। যদি থার্মোমিটার না থাকে তো হাত দিয়ে স্পর্শ করেই বলা যাবে কোন বোতলটা গরম। বোঝা যাবে, যে বোতলটা উল বা পশমী কাপড় দিয়ে জড়ানো, সেই বোতল বেশি গরম।

কারণ হলো, উলের কাপড়ে জড়ানো বলে বোতল সরাসরি বাতাসের সংস্পর্শে আসতে পারছে না, কিন্তু যে বোতলটি খোলা অর্থাৎ উলের কাপড়ে জড়ানো নয়, সেই বোতলটি সরাসরি বাতাসের সংস্পর্শে আসছে, তাই এর তাপ তাড়াতাড়ি বিকিরীত হচ্ছে। উলের কাপড় তেমন তাপ পরিবাহী নয় বলে তাপ সহজে বিকিরীত হতে পারে না। এই কারণে উলের কাপড়ে জড়ানো বোতল অন্যটির চেয়ে বেশিক্ষণ গরম থাকে।

শীতকালে উলের পোশাক আমাদের দেহ তাপের পক্ষে অপরিবাহী। দেহের তাপ তা ধরে রাখে, বিকিরীত হতে দেয় না। ফলে বাইরের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় আমরা শীত অনুভব করি।

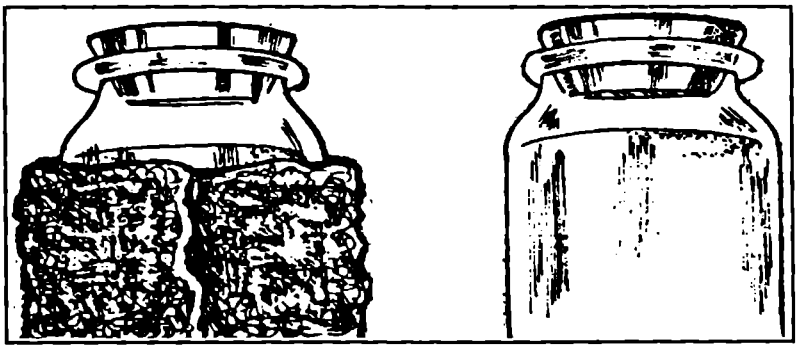

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, শীতকালে উলের পোশাক আমাদের দেহে তাপ ধরে রাখে। তাই আমরা ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য উলের জামাকাপড় পরি।

www.pathagar.com

উত্তাপে ধাতু সম্প্রসারিত হয়—প্রমাণ কর?

উপকরণ : এক মিটার লম্বা তামার তার, ভারি কোনো বস্তু, মোটা মোটা কয়েকটা বই ও কয়েকটা মোমবাতি।

কার্যপ্রণালী : তামার তারের একটা দিক, টেবিলের এক দিকের কিনারা থেকে ৫৫ সেন্টিমিটার ভেতরে কোনো একটা ভারি বস্তুর সঙ্গে বাঁধতে হবে। তারের অপর দিকটা টেবিলের অপর কিনারা দিয়ে ঝুলিয়ে দিতে হবে। টেবিলের কিনারায় অবশ্য মোটা মোটা কয়েকটা বই রাখতে হবে। বইয়ের ওপর দিয়েই ঝুলিয়ে দিতে হবে তার। ঝোলানো তারের মুখে ভারি কোনো বস্তু বেঁধে দাও, যাতে তা টানটান থাকে। একটা ভারি বস্তু তারের মুখে বেঁধে তা স্থির হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। স্থির হবার পর, যেখানে স্থির হচ্ছে টেবিলের পায়ায় সেখানে একটা চিহ্ন দিতে হবে।

এখন টান করে বাঁধা তারের নিচে কিছু দূর পরপর ৩-৪টি মোমবাতি জ্বালাতে হবে। মোমবাতির নিচে অবশ্যই কাগজ রেখে নিতে হবে নাহলে টেবিল নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

মোমবাতি আগ-পাছ করে পুরো তার গরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। প্রায় ৬-৭ মিনিট পর দেখা যাবে, ভারি বস্তুর সঙ্গে ঝোলানো তারের মুখ আগের চিহ্ন থেকে আরো নিচে নেমে গেছে। উত্তপ্ত হওয়ায় তারের দৈর্ঘ্য বেড়েছে—এটা তারই প্রমাণ।

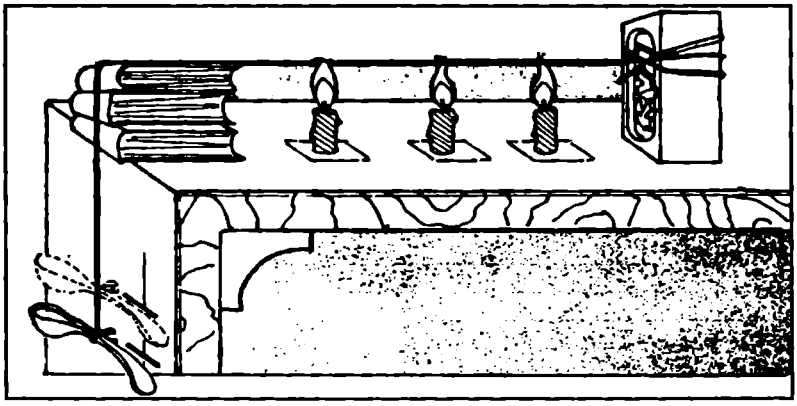

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, উত্তাপে ধাতু সম্প্রসারিত হয়।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ৩৪

কঠিন বস্তু তাপ পরিবাহী—প্রমাণ কর?

উপকরণ : ২৫ সেন্টিমিটার লম্বা একটা লোহা বা ধাতুর রড, একটা মোমবাতি এবং তিনটি মার্বেল।

কার্যপ্রণালী : লম্বা লোহার রডের মুখ থেকে ৫ সেন্টিমিটার ভেতরে গলানো মোমবাতির ফোঁটা ফেলে, তাতে আটকে দিতে হবে একটা মার্বেল। মোমবাতির ফোঁটা শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে যাতে মার্বেলটি পড়ে না যায়। এমনি করে, প্রথম মার্বেলের ৩-৪ সেন্টিমিটার দূরে একইভাবে দ্বিতীয় মার্বেল এবং একই দূরত্বে তৃতীয় মার্বেল স্থাপন করতে হবে।

এবার প্রথম মার্বেলটি রডের যে দিকে বসানো হয়েছে, রডের সেই প্রান্ত মোমবাতির আগুনে গরম করতে থাক। দেখ কি হয়। রড উত্তপ্ত হওয়ায় মার্বেলের ওপর তার কি কোনো প্রতিক্রিয়া হচ্ছে? মার্বেলের তিনটি কি একই সময় মাটিতে পড়ছে, না একটির পর একটি পড়ছে?

যদি স্পষ্ট করে লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে রডের মুখ উত্তপ্ত হলে, মুখের সবচেয়ে কাছের মোম গলে গিয়ে প্রথম মার্বেলটি মাটিতে পড়বে, তারপর তাপ পৌঁছাবে দ্বিতীয়টিতে এবং দ্বিতীয় মার্বেলটি মাটিতে পড়বে। সবশেষে তাপ পৌঁছাবে তৃতীয়টিতে এবং তৃতীয় মার্বেলটি সবশেষে মাটিতে পড়বে।

অর্থাৎ কঠিন পদার্থ এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে তাপ প্রেরণ করে, যাকে বলে তাপ পরিবহন। এই বৈশিষ্ট্যকে বলে তাপ পরিবাহিতা।

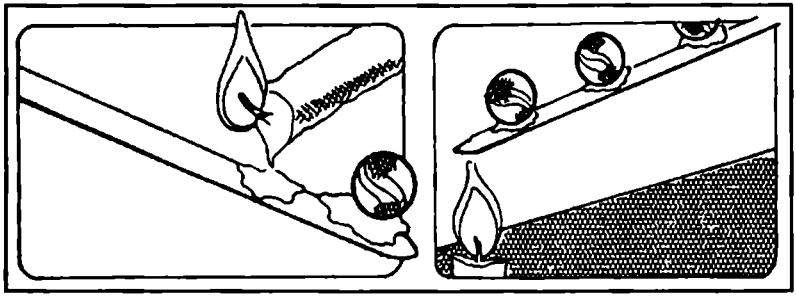

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, কঠিন বস্তু অর্থাৎ ধাতু একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে তাপ পরিবহন করে। এ জন্যই কঠিন বস্তু তাপ পরিবাহী।

www.pathagar.com

প রী ক্ষা ৩৫

সব ধাতুই তাপ পরিবাহী কিন্তু তামা, পিতল ও অ্যালুমিনিয়ামের চেয়ে আরো ভালো পরিবাহী—প্রমাণ কর?

উপকরণ : ১টি তামার রড, একটি পেতলের এবং একটি অ্যালুমিনিয়ামের রড, তিনটি মার্বেল ও মোমবাতি।

কার্যপ্রণালী : প্রতিটি রডের এক প্রান্তের ৫ সেন্টিমিটার দূরে আগের পরীক্ষার মতো মোম গলিয়ে একটি মার্বেল বসাতে হবে। প্রতিটি রডে একটির বেশি মার্বেল বসানো যাবে না।

এখন আগের পরীক্ষার মতো একটি-একটি করে তিনটি রড গরম করতে হবে। এবং মার্বেল পড়ার সময় নোট করতে হবে। এই পরীক্ষা একাধিক বার করতে হবে, কারণ মার্বেল বসানোর জন্য রডের ওপর গলানো মোমের পরিমাণ সমান নাও হতে পারে, যার জন্য মার্বেল পড়ার সময়েরও তারতম্য হতে পারে।

এই পরীক্ষায় দেখা যাবে যে তামার রডের মার্বেল আগে পড়েছে, অন্যগুলির তুলনায়। অর্থাৎ পিতল ও অ্যালুমিনিয়ামের চেয়ে তামার তাপ পরিবাহী ক্ষমতা বেশি বলে সে তাড়াতাড়ি গরম হয়। ফলে মোম আগে গলে গিয়ে মার্বেলটি নিচে পড়ে সবার আগে।

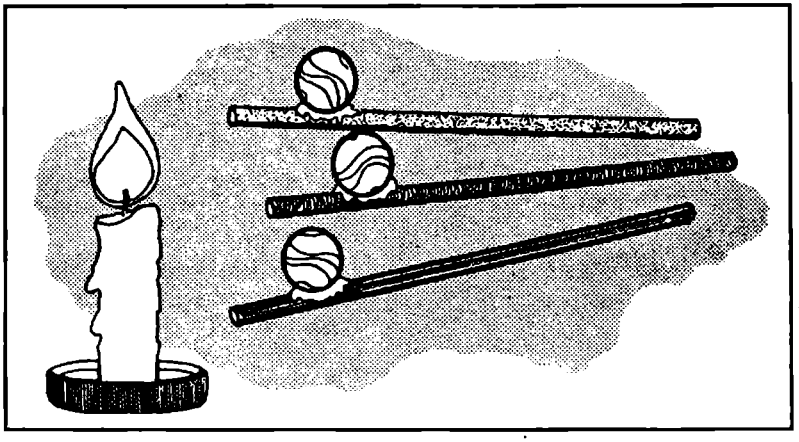

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, ধাতু তাপ পরিবহন করে কিন্তু পিতল ও অ্যালুমিনিয়ামের চেয়ে তামার তাপ পরিবাহী ক্ষমতা বেশি। অর্থাৎ তামা ভালো তাপ পরিবাহী।

www.pathagar.com

প রী ক্ষা ৩৬

অ্যাসিড ও ক্ষার যে আলাদা তা কীভাবে প্রমাণ কর?

উপকরণ : নীল ও গোলাপি লিটম্যাস পেপার (ল্যাবরেটরির দোকানে পাওয়া যাবে), ৫টি কাচের বাটি, ভিনেগার, পানি, দুধ, সাবানের পানি এবং লেবুর রস।

কার্যপ্রণালী : কাচের বাটিগুলোতে আলাদা আলাদা ভাবে ঢালতে হবে ভিনেগার, পানি, দুধ, সাবান-পানি এবং লেবুর রস। লিটম্যাস পেপারের ৫টি টুকরো ৫টি বাটিতে ডুবিয়ে দিতে হবে। লিটম্যাস পেপারের রঙ লক্ষ্য করতে হবে। দেখা যাবে ভিনেগার ও লেবুর রসে ডোবানো নীল লিটম্যাস পেপারের রঙ হয়ে গেছে গোলাপি, কিন্তু অন্য তিনটিতে লিটম্যাস পেপারের রঙের কোনো পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ নীল লিটম্যাস পেপার অ্যাসিডের সংস্পর্শে গোলাপি রঙ ধারণ করে।

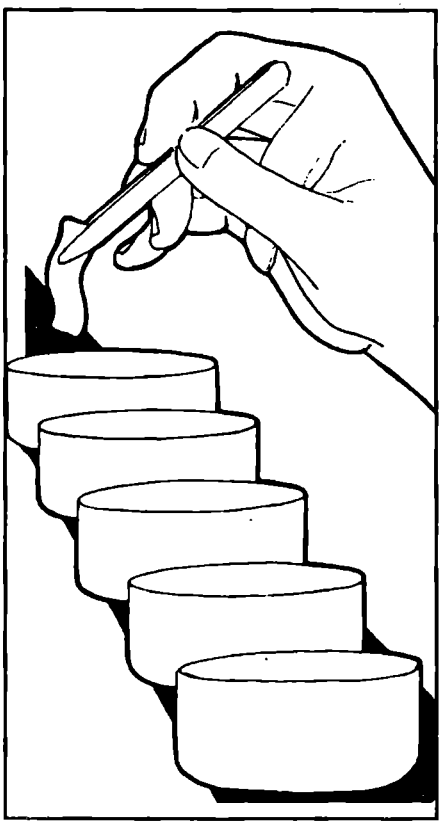

অনুরূপভাবে গোলাপি লিটম্যাস পেপার খণ্ডকে ৫টি ভাগে ভাগ করে, প্রত্যেক বাটিতে ডুবিয়ে দেয়া যাক। এবার দেখা যাবে ৫টির মধ্যে মাত্র একটি পেপারের রঙ পরিবর্তন হয়েছে। সাবান-পানি ডোবানো লিটম্যাস কাগজের গোলাপি রঙ নীল হয়েছে। কারণ হলো, সাবান-পানিতে আছে ক্ষারের উপাদান, যা লিটম্যাস পেপারের গোলাপি রঙকে নীল রঙে পরিণত করেছে।

দুধ ও পানিতে ডোবানো লিটম্যাস পেপারের রঙে কোনো পরিবর্তন হয়নি, কারণ তাতে অ্যাসিড বা ক্ষার কিছুই নেই।

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, অ্যাসিড ও ক্ষার আলাদা।

www.pathagar.com

আমারা যখন নিঃশ্বাস ত্যাগ করি তখন কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ত্যাগ করি–তা কিভাবে প্রমাণ করবে?

উপকরণ : একটি টেস্টটিউব, স্ট্র-পাইপ এবং চুন মেশানো পানি। চুন মেশানো পানি দরকার এই জন্য যে, কার্বন-ডাই-অক্সাইডের প্রতিক্রিয়ায় চুন মেশানো পানির রঙ দুধের মতো সাদা হয়ে যায়। আর চুনমিশ্রিত পানিই হলো কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের অস্তিত্ব প্রমাণের সর্বোত্তম উপায়।

কার্যপ্রণালী : মানুষের প্রশ্বাসের সময় বা নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে তা প্রমাণের জন্য, টেস্টটিউবের তিন চতুর্থাংশ চুন মেশানো পানি দিয়ে পূর্ণ করতে হবে। এবার টেস্টটিউবের ভেতর স্ট্র-পাইপের মাধ্যমে ফুঁ দিতে হবে। ফুঁ দিলে দেখা যাবে চুন মেশানো পানির বুদ্‌বুদ্‌গুলি পানির ওপরে এসে ফেটে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে।

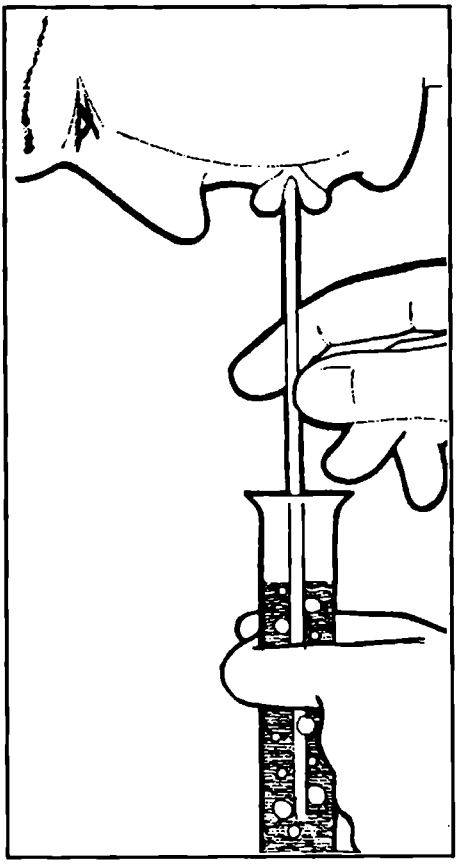

অন্যদিকে দেখা যাবে, স্বচ্ছ চুনের পানি দুধের মতো সাদা রঙ ধারণ করেছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, পাইপের মাধ্যমে যে ফুঁ দেয়া হলো, সেই ফুঁ-এ বা বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছিল।

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, মানুষের শরীরের ভেতর থেকে ফুসফুস যখন নিঃশ্বাস ছাড়ে তখন তাতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসে থাকে।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ৩৮

সত্যিই কী কার্বন-ডাই-অক্সাইডে আগুন নিভে যায়?

উপকরণ : সত্যিই কি কার্বন-ডাই-অক্সাইডে আগুন নেভানো যায় এই পরীক্ষার জন্য প্রথমেই জানতে হবে বাড়িতে কিভাবে কার্বন-ডাই-অক্সাইড তৈরি করা যায়। সেটাই প্রথমে জানতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন, দুটি কাচের গ্লাস, ভিনেগার, বেকিং পাউডার, পানি, দিয়াশলাই ও ন্যাপথলিন।

কার্যপ্রণালী : দুটি গ্লাসের একটিতে সামান্য ভিনেগার এবং অপরটিতে বেকিং পাউডার (সোডিয়াম বাই-কার্বোনেট) নিয়ে প্রতিটির সঙ্গে মেশাতে হবে আধা কাপ পানি। এখন একটি জ্বলন্ত দিয়াশলাইয়ের কাঠি দুটি গ্লাসের সামনে ধরতে হবে। দেখা যাবে, দিয়াশলাইয়ের কাঠি দিব্যি জ্বলছে। এবার, সোটিয়াম বাই-কার্বোনেট মিশ্রণের মধ্যে ঢালতে হবে ভিনেগার। দেখা যাবে, অসংখ্য বুদ্‌বুদ ওপরে উঠছে। আসলে এইসব বুদ্‌বদ্‌গুলি কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়া আর কিছু নয়। আর ভিনেগারের সঙ্গে সোডার প্রতিক্রিয়া তা সৃষ্টি হলো।

এখন দেখতে হবে, এই গ্যাস বাস্তবে আগুন নেভায় কিনা। এজন্য আবার একটি জ্বলন্ত দিয়াশলাইয়ের কাঠি নতুন মিশ্রণের ওপরে ধর। সঙ্গে সঙ্গে দিয়াশলাইয়ের কাঠিটা নিভে যাবে। আবার যদি দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে ধর, আবার নিভে যাবে। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, কার্বন-ডাই-অক্সাইডে আগুন নেভে।

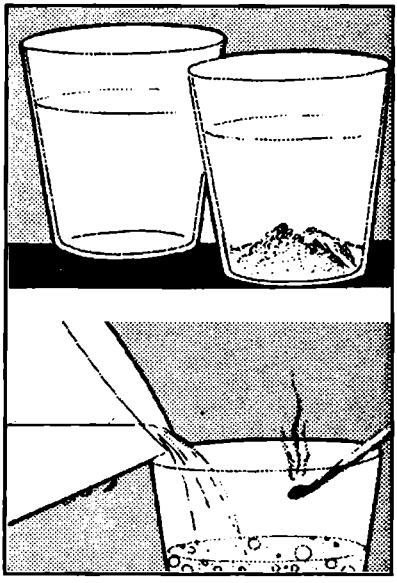

কিন্তু কেন আগুন নেভে সেটারও একটা ব্যাখ্যা আছে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বাতাসের চেয়ে ভারী হওয়ায়, আগুনের শিখার চারপাশে এক ধরনের দেয়াল তৈরি করে, যা অক্সিজেন প্রবেশ করতে দেয় না। আগুন জ্বলার জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন। কাজেই অক্সিজেন না পেলে আগুন নিভে যায়।

এই পরীক্ষা পর ঐ মিশ্রনে টুক করে দু-একটি ন্যাপথলিন ছেড়ে দিলে দেখা যাবে ন্যাপথলিনগুলো নেচে বেড়াচ্ছে।

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো, কার্বন-ডাই-অক্সাইডে আগুন নেভে।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ৩৯

ঢাকা পাত্রের ভেতর বা আবদ্ধ জায়গায় জ্বলন্ত মোমবাতি নিভে যায় কেন?

উপকরণ : বড় মুখওয়ালা একটি জার বা বোতল, একটি মোমবাতি, কার্ডবোর্ডের একটা টুকরো, দিয়াশলাই।

কার্যপ্রণালী : প্রথমে দিয়াশলাইয়ে কাঠি টুকে মোমবাতিটা জ্বালাতে হবে। বড় মুখওয়ালা জ্বার বা বোতলের ভেতরে বসাতে হবে জ্বলন্ত মোমবাতিটি। এখন কার্ডবোর্ডের টুকরো দিয়ে মুখটা ঢেকে দিতে হবে। দেখা যাবে, অল্পক্ষণ পরেই মোমবাতিটা নিভে গেছে।

অন্যভাবে প্রমাণের জন্য আরেকটি পরীক্ষা করা যেতে পারে। চওড়া একটি প্লেটের ভেতর কিছু পানি নাও। প্লেটের ভেতর নিভে যাওয়া মোমবাতিটি জ্বালিয়ে বসাতে হবে। এবার জ্বারটি উল্টো করে জ্বলন্ত মোমবাতির ওপর বসিয়ে দিতে হবে। একটু পরে দেখা যাবে, মোমবাতিটা নিভে গেছে এবং পানির মাত্রা কিছুটা ওপরের দিকে উঠেছে। এর কারণ হলো, শিখা প্রজ্জ্বলিত রাখতে জারের ভেতরের বাতাস, যেই ভেতরের বাতাস নিঃশেষ হয়ে গেছে, অমনি সেই শূন্যতা পূরণ করতে পানি উর্ধ্বমুখী হবে।

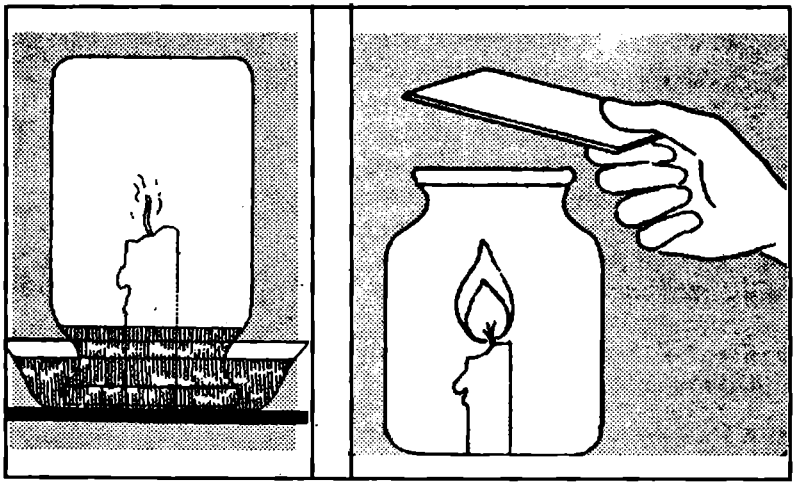

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো, আবদ্ধ অবস্থায় আগুন বা জ্বলন্ত মোমবাতি জ্বলে না, নিভে যায়।

www.pathagar.com

প রী ক্ষা ৪০

কার্বন-ডাই-অক্সাইড যে বাতাসের চেয়ে ভারী–প্রমাণ কর।

উপকরণ : তিনটি মোমবাতি (যথাক্রমে ২ সেন্টিমিটার, ৫ সেন্টিমিটার ও ৪ সেন্টিমিটার লম্বা), একটি পাত্র, বেকিং পাউডার।

কার্যপ্রণালী : নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমরা যে বাতাস গ্রহণ করি, তা অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন প্রভৃতি বিভিন্ন গ্যাসের মিশ্রণ। কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মতো কয়েকটি গ্যাস বাতাসের চেয়ে ভারী এবং হাইড্রোজেনের মতো কয়েকটি গ্যাস আবার বাতাসের চেয়ে হালকা। নিচের পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করা যাবে যে, কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাতাসের চেয়ে ভারী।

প্রথমে একটি পাত্রে তিনটি মোমবাতি বসাও সোজা করে। পাত্রের নিচে চড়িয়ে দিতে হবে বেকিং পাউডার (সোডিয়াম বাই-কার্বনেট)। এরপর মোমবাতিগুলো জ্বালিয়ে দাও। এভার ধীরে ধীরে পাত্রের গা বেয়ে কিছুটা ভিনেগার ঢালতে হবে। সাবধান ভিনেগার যেন মোমবাতির শিখার ওপর না পড়ে। কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে পাত্রের তলদেশ থেকে বুদ্‌বুদ্‌ কারে গ্যাস তৈরি হচ্ছে। বুদ্‌বুদ্‌ তৈরির কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে লম্বায় সবচেয়ে ছোট মোমবাতিটা প্রথমে নিভেছে, তারপর নিভে গেছে মাঝারি মোমবাতি এবং সবশেষে বড়টি। এক এক করে মোমবাতিগুলো নিভে যাবার কারণ হচ্ছে সোডা ও ভিনেগারের মিশ্রণে পাত্রের নিচে তৈরি হয়েছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড। কার্বন-ডাই-অক্সাইড ভারী বলে পাত্রের নিচের বাতাস অপসারিত করে সেখানে পুঞ্জীভূত হয়েছে। গ্যাসের পরিমাণ যত বাড়তে থাকবে, ততই সে ওপরের দিকের বাতাস সরিয়ে ওপরের স্থান গ্রহণ করবে। আর এভাবেই একে একে মোমবাতিগুলো নিভে গেছে।

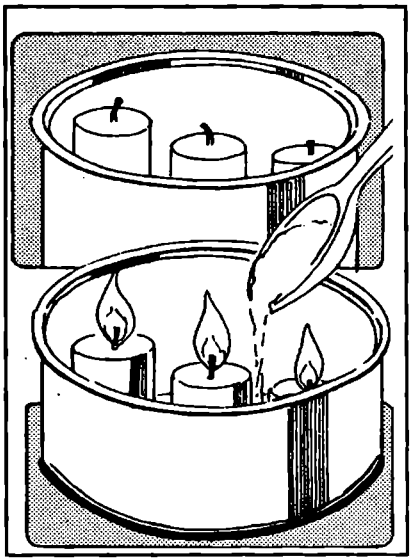

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, বাতাসের চেয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ভারি।

www.pathagar.com

প রী ক্ষা ৪১

লোহায় মরিচা পড়ার প্রক্রিয়ার সঙ্গে আবহাওয়ার একটা প্রভাব আছে–প্রমাণ কর।

উপকরণ : টেস্টটিউব, পানি, লোহার পেরেক।

কার্যপ্রণালী : কোনো লৌহজাতীয় পদার্থ পানি ও বাতাসের সংস্পর্শে এলে, তার ওপ একটা লালচে আস্তরণ পড়ে, এই আস্তরণকে বলে মরিচা। সহজ একটি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করা যাবে লোহায় মরিচার পড়ার জন্য আবহাওয়ার প্রভাব আছে।

প্রথমে টেস্টটিউব নিয়ে তাতে পানি ভর্তি করতে হবে। তারপর পানি ফেলে দিতে হবে, তবে ভেতরটা ভেজা ভেজা থাকবে। এবার লোহার পেরেকগুলো টেস্টটিউবের মধ্যে দিয়ে বেশ ভালো করে ঝাঁকিয়ে নিতে হবে। দেখা যাবে, টেস্টটিউবের ভেজা গায়ে পেরেকগুলো আটকে আছে। টিউবটি এবার উল্টো করে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ভেতরে আটকে থাকা পেরেকগুলো বের করতে হবে।

এবার একটা প্লেটে পানি দিয়ে, তার ঠিক মাঝখানে টেস্টটিউবটি নিচের দিকে মুখ করে দাঁড় করাতে হবে। এভাবে রাখতে হবে অন্তত দুদিন। দুদিন পর লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্লেটের পানি ওপরের দিকে উঠে টেস্টটিউবে প্রবেশ করেছে।

এ থেকে বোঝা যায়, টিউবের ভেতরের কিছু ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার দরুণ ভেতরের বাতাস নিঃশেষিত হয়েছে এবং অদ্ভুত সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে পানি ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। আগের পরীক্ষায় বোতলের ভেতরে মোমবাতি রাখায় ভেতরের পানির মাত্রা একইভাবে উপরের দিকে উঠেছিল। ফলে বাতাসের সে অংশ অগ্নিশিখায় নিঃশেষিত হয় এবং মরিচা পড়ে, তাই অক্সিজেন বলে পরিচিত। কাজেই বলা যায় যে, মরিচা পড়া হলো ধীরে দহন ক্রিয়ার অনুরূপ এক প্রক্রিয়া যা বায়ুর এক-পঞ্চামাংশ অক্সিজেন দহন করে।

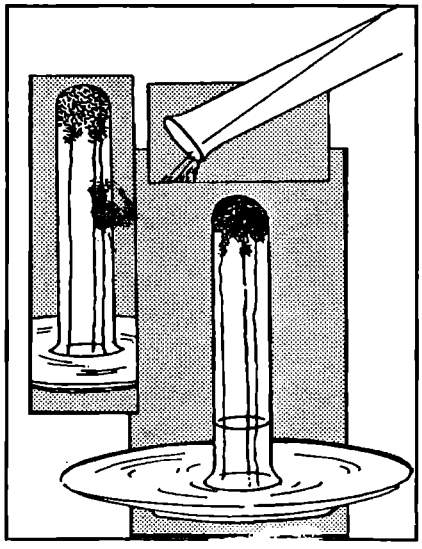

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, লোহা জাতীয় পদার্থে যে মরিচা পড়ে তার জন্য আবহাওয়ার বিরাট প্রভাব রয়েছে।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ৪২

একটি বৈদ্যুতিক বাল্‌ব ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলো দিলেও তার ফিলামেন্ট জ্বলে যায় না–কেন?

উপকরণ : ১৫ সেন্টিমিটার লম্বা একটা ফিউজ তার, একটা পেন্সিল, মোমবাতি।

কার্যপ্রণালী : বাড়ির বৈদ্যুতিক বাল্‌ব, সুইচ টিপলেই আলো জ্বলতে থাকে। তবে কোনো জিনিস যখন জ্বলে তার রূপান্তরও ঘটে। তাই যদি হয়, তাহলে বৈদ্যুতিক বাল্‌ব কিভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমন কি মাসের পর মাস জ্বলতে থাকে। কিন্তু কিভাবে? একটা পরীক্ষার মাধ্যে তা প্রমাণ করা যায়।

প্রথমে ১৫ সেন্টিমিটার লম্বা একটা ফিউজ তার নিয়ে তার একটা প্রান্ত পেন্সিলে জড়িয়ে একটা ফাঁসের মতো করতে হবে। এই ফাঁসের দিকটা গরম করতে হবে মোমবাতির শিখাতে। কিছুক্ষণ পর এই ফাঁস উত্তপ্ত লাল হয়ে উঠবে। আরো উত্তপ্ত করতে থাকলে, এমন একটা পর্যায়ে আসবে, যখন তা কয়েক মুহূর্ত সাদা আলো দিয়ে পুড়ে যাবে।

বৈদ্যুতিক বাল্‌বের ভেতরে যে তার থাকে, (যাকে বলে ফিলামেন্ট) খুব গরম হয়ে তা আলো দিতে থাকে, কারণ এর ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু ফাঁসের মতো, তা জ্বলে নিভে যায় না। এর কারণ কি? কারণ হলো, বাল্‌বের ভেতরে কোনো অক্সিজেন থাকতে দেওয়া হয় না। এবং অক্সিজেনই কোনো বস্তুর দহন ক্রিয়ায় সাহায্য করে। বৈদ্যুতিক বাল্‌বের ভেতরটা শূন্য রাখা হয়, অথবা অক্সিজেন ছাড়া অন্য কোনো গ্যাস রাখা হয়, যা দহন ক্রিয়ার প্রতিকূল।

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, একটি বৈদ্যুতিক বাল্‌ব ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলো দিলেও তার ফিলামেন্ট জ্বলে বা পুড়ে যায় না।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ৪৩

কোনো ভারী বস্তু প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ করে তোলা যায় না, কিন্তু সেই ভার একটা পুলির সাহায্যে সহজেই তোলা যায়–কিভাবে?

উপকরণ : দুটো শক্ত লাঠি, ৬ মিটারের মতো শক্ত মসৃণ সুতো, দুজন বন্ধু।

কার্যপ্রণালী : এই পরীক্ষাটা একটা খেলার মতো। তোমার থেকে শক্তিশালী দুজন বন্ধুকে এই খেলায় সামিল কর। এবার বন্ধু দুজনের প্রত্যেকের হাতে একটি করে লাঠি দিয়ে ১ মিটার দূরে দাঁড় করাও। সুতোর একটা দিক একটা লাঠিতে বেঁধে তাতে কয়েকটা পাক দাও (যেভাবে ছবিতে দেখানো হয়েছে)। সুতোর অন্য প্রান্ত থাকবে তোমার হাতে। এবার তোমার বন্ধু দজনকে বল, নিজেদের দিকে যত জোরে পারে, লাঠিটা টানতে। কিন্তু সমস্ত শক্তি দিয়ে তারা তা টানতে পারবে না। শুধু তাই নয়, অবাক হয়ে দেখবে, সামান্য শক্তিতেই লাঠি দুটি পরস্পরের নিকটে চলে যাচ্ছে।

এবার চিন্তা কর, এই শক্তির উৎস কোথায়। যদি মনে কর তোমার দৈহিক শক্তি, তাহলে ভুল করবে। যে শক্তি এই কাজ করছে, তা হলো পুলি। লাঠির সঙ্গে সুতোর কয়েকটা পাক দিয়ে তুমি সেই ব্যবস্থাই করেছ, যা একটা চেন পুলি করে থাকে। এখানে ওজনের পরিবর্তে, তোমার দুজন বন্ধুর শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে, লাঠি দুটিকে পরস্পর থেকে দূরে রাখতে।

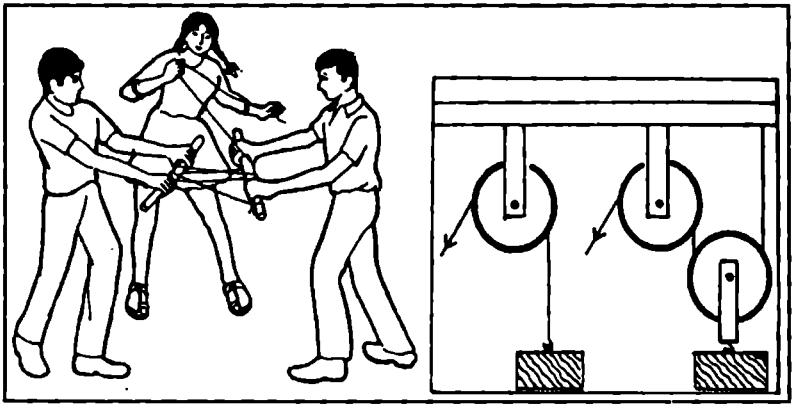

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, কোনো ভারী বস্তু প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ করে তোলা যায় না, কিন্তু সেই ভার একটা পুলির সাহায্যে সহজেই তোলা যায়।

www.pathagar.com

প রী ক্ষা ৪৪

জেট বিমান কী নিয়মে চলে?

উপকরণ : শুধুমাত্র একটা বেলুনের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় জেট বিমান কি নিয়মে চলে।

কার্যপ্রণালী : প্রথমে বেলুনটা ফুঁ দিয়ে সম্পূর্ণ ফোলাতে হবে। ফোলানো অবস্থাতেই মুখটা ভালো করে টিপে ধরে রাখ। বেলুনটা ফুলেই থাকবে। এখন মুখটা ছেড়ে দাও। জোরে বাতাস মুখ দিয়ে বেরুতে থাকবে এবং বেলুন সামনের দিকে ছিটকে যাবে। সহজ কথায় বলতে গেলে, জেট বিমানও ঠিক এই নিয় মেনেই সামনের দিকে এগিয়ে যায়। তবে প্রশ্ন জাগতে পারে, বেলুনের সামনের দিকে যাবার কারণ কি?

বেলুনটা ফোলানোর অর্থ, প্রচুর বাতাস দিয়ে অর্থাৎ জোরে ফুঁ দেয়ার মাধ্যমে প্রচুর বাতাস ভরা হয়েছে। এই বাতাস বেলুনের গায়ের চারদিকে সমান চাপ দিচ্ছে। যতক্ষণ বেলুনের মুখটা টিপ দিয়ে ধরে রাখা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বেলুনের ভেতরের বাতাস, সবদিকে সমান চাপ দিচ্ছে এবং বেলুন স্থির আছে।

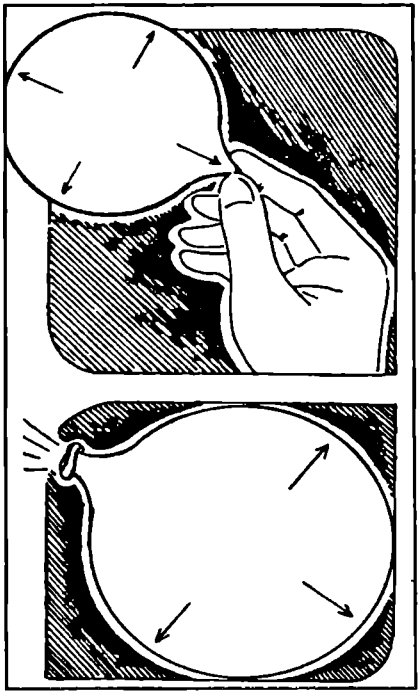

কিন্তু যে মুহূর্তে বেলুনের মুখটা ছেড়ে দেয়া হবে, সেই মুহূর্তে বেলুনের মুখ থেকে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে এবং ভেতরের চাপ কমে যাচ্ছে। তখনও কিন্তু বেলুনের ভেতরে কিছুটা চায়ুচাপ রয়েছে এবং এই বায়ুচাপই বেলুনটাকে বিপরীত দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। এই এই ক্রিয়া চলবে, ততক্ষণ যতক্ষণ না বেলুনের ভেতরের বাতাস সম্পূর্ণরূপে বেরিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ বেলুনের ভেতরের বাতাস সম্পূর্ণ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বেলুনটি বাতাস বের হওয়ার বিপরীত দিকে ধাবিত হতে থাকবে।

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, জেট বিমান ইঞ্জিনের যেদিক দিয়ে বাতাস বের হয়ে যায় তার বিপরীত দিকে এগিয়ে যায়।

www.pathagar.com

বিমান কিভাবে ওড়ে?

উপকরণ : ৩ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য ও ৫ সেন্টিমিটার প্রস্থের এক শিট কাগজ এবং একটি পেনসিল।

ব্যাখ্যা : আমরা জানি, শক্তিশালী ইঞ্জিনের সাহায্যেই প্লেন ওড়ে। তাহলে গ্লাইডার ওড়ে কিভাবে? গ্লাইডারে তো ইঞ্জিন থাকে না। অর্থাৎ প্লেনও ওড়ে তার ইঞ্জিনের জন্য নয়, তার ডানার আকারের জন্য।কারণার এক বিশেষ ধরনের গঠন বা কাঠামো আছে, যাকে বলে এরোফয়েল আর তাতে আছে বিশেষ গুণ, যার জন্য এর উপরিভাগের পৃষ্ঠদেশের ওপর দিয়ে বাতাস পৃষ্ঠের নিম্নভাগের চেয়ে অধিক দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হয়। এবং একই সময় পুচ্ছদেশের এরোফয়েলে মিলিত হয়।

বাতাসের গতি যত বেশি হবে তার আপতিত চাপ তত কম হবে। স্পষ্টতই, ডানার উপরিভাগে আপতিত বায়ুচাপ, উপরিভাগের পৃষ্ঠদেশের তুলনায় কম হবে, যা শুধু ডানাকেই উর্ধ্বমুখী করে না সমগ্র বিমানকেই উর্ধ্বমুখী করে। বায়ুচাপপের এই তারতম্যের ফলে যে শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে, সেই শক্তিই বিমানটিকে উপরের দিকে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই শক্তিকে বলে উত্তোলন শক্তি।

কার্যপ্রণালী : এই উত্তোলন শক্তি প্রমাণের জন্য ৩০ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য ও ৫ সেন্টিমিটার প্রস্থ কাগজের সরু দিকটা দুহাত দিয়ে ধরতে হবে। এবার মুখ দিয়ে খুব জোরে ফুঁ দিতে হবে। দেখা যাবে কাগজ ওপরের দিকে উঠছে। এর কারণ কি? কারণ একই, যখন জোরে ফুঁ দেয়া হচ্ছে, কাগজের ওপরের বাতাসের গতি কাগজের নিচের বাতাসের গতির তুলনায় বেশি, অর্থাৎ কাগজের ওপরের বায়ুর গতি বেশি হওয়ায় তা এক উত্তোলক শক্তিরূপে কাজ করছে।

এখন ৫ সেন্টিমিটার চওড়া কাগজের উভয়দিক জোড়া দিতে হবে। ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে, সেইভাবে পেন্সিলটা প্রবেশ করাতে হবে। এখন টেবিলের কিনারায় তা বসিয়ে পৃষ্ঠদেশের ওপর দিয়ে জোরে জোরে ফুঁ দিতে হবে। দেখা যাবে, উত্তোলক শক্তি উৎপন্ন হওয়ায়, বিমানের ডানার আকৃতির মডেলটি ওপরের দিকে ওঠার চেষ্টা করছে।

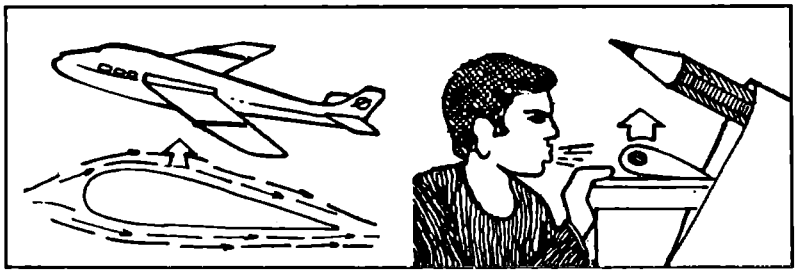

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, বিমান আসলে শক্তিশালি ইঞ্জিনের সাহায্যে ওড়ে না, ওড়ে এক বিশেষ উত্তোলক শক্তিতে।

www.pathagar.com

প রী ক্ষা ৪৬ একটি গাড়ির তেলের ট্যাঙ্কে পেট্রল ভরে ড্রাইভার যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারে। কিন্তু গাড়ির চালিকা শক্তির উৎস কোথায়?

উপকরণ : রাবার ক্যাপসহ ইঞ্জেকশনের একটা খালি শিশি, ২টি দিয়াশলাইয়ের কাঠি, অতসী কাঁচ।

কার্যপ্রণালী : গাড়ির চালিকা শক্তি কোথায় তা জানতে ছোট্ট একটা পরীক্ষা করতে হবে। প্রথমে রাবার ক্যাপসহ ইঞ্জেকশনের খালি শিশি নিয়ে ২টি দিয়াশলাইয়ের কাঠি নিয়ে বারুদের অংশটা নিচের দিকে করে ওই খালি ইঞ্জেকশনের শিশিতে রাখতে হবে। এরপর রাবারের ক্যাপটি ভিজিয়ে শিশির মুখে রাখতে হবে। রাবার ক্যাপটি যেন শিশির মুখে এঁটে না বসে, অর্থাৎ আলগা করে বসাতে হবে। এখন শিশিটি রোদে রেখে অতসী কাচের সাহায্যে সূর্যরশ্মি বদ্ধ শিশির ভেতরে রাখা দিয়াশলাই কাঠির বারুদের ওপর ফেলতে হবে। সূর্যের তাপে বারুদ জ্বলে উঠবে এবং তারপর শিশির মুখের রাবার ক্যাপটা সজোরে ছিটকে বেরিয়ে যাবে।

এই হলো, গাড়ির চালিকা শক্তির আসল শক্তি। তফাৎ হলো, দিয়াশলাই কাঠির বারুদের পরিবর্তে গাড়িতে জ্বালানি হিসেবে পেট্রোল ব্যবহার করা হচ্ছে। পেট্রোল ও বাতাসের সংমিশ্রণে পেট্রোল পুড়ে যাচ্ছে। প্রজ্জ্বলের জন্য গাড়িতে অতসী কাচের পরিবর্তে ব্যবহার করা হচ্ছে 'স্পার্ক প্লাগ'। এই স্পার্ক প্লাগ পেট্রোল ও বায়ুর মিশ্রণে প্রজ্জ্বলনের কাজ করছে।

দহন ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেট্রোল ও বায়ু সশব্দে প্রসারিত হয়ে পিস্টনে ধাক্কা দেয়। পিস্টনের সঙ্গে যুক্ত রড পেছন দিকে চালিত হয়ে ক্র্যাঙ্কশাফ্টকে ঘোরায় এবং ক্র্যাঙ্কশাফ্ট আবার ঘোরায় গাড়ির চাকাকে।

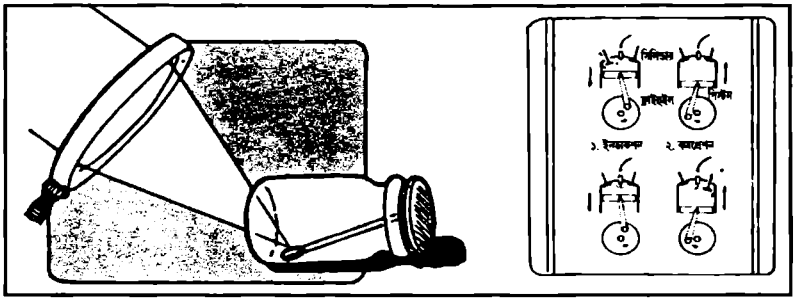

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, শুধু পেট্রোল ভরলেই গাড়ি চলে না। পেট্রোল, বাতাসের সংমিশ্রণে যখন পেট্রোল পুড়ে যায় তখন পেট্রোল ও বায়ু সশব্দে প্রসারিত হয়ে গাড়ির ভেতরে থাকা পিস্টনে ধাক্কা দেয়। পিস্টনের সঙ্গে যুক্ত রড পেছন দিকে চালিত হয়ে ক্র্যাঙ্কশাফ্টকে ঘোরায় এবং ক্র্যাঙ্কশাফ্ট ঘোরাতে থাকে গাড়ির চাকা, এভাবেই গাড়ি সামনের দিকে চলতে থাকে।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ৪৭

কাঠে আগুন ধরালে যে আগুনের শিখা দেখা যায়, তাতে কখনও লাল, কখনও নীল, কখনও সবুজ আবার কখনও পীত বর্ণের শিখা দেখা যায়। কিন্তু কোথা থেকে আগুনের শিখায় এই রঙ আসে?

উপকরণ : লবণ, কস্টিক সোডা, বেকিং পাউডার, ফিটকিরি, চুন, একটাকার একটা কয়েন ও সাঁড়াশি ইত্যাদি।

কার্যপ্রণালী : প্রথমে চকচকে একটা কয়েন সাঁড়াশিতে ধরে পানিতে ভিজিয়ে লবণের মধ্যে এমনভাবে ঢোকাতে হবে, যাতে ভেজা কয়েনের গায়ে লবণকণা লেগে থাকে। স্পিরিট ল্যাম্পে কয়েনটি গরম করলে পীত বর্ণের শিখা দেখা যাবে। এই পীত বর্ণের শিখা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত শিখার ওপর কয়েনটি ধরে রাখতে হবে। এভাবে সংগৃহীত অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে একটার পর একটা পরীক্ষা চালাতে হবে এবং প্রতি সামগ্রীর শিখার রঙ লিখে রাখতে হবে। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিখার রঙের পরিবর্তন নাও হতে পারে, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা হবে। যেমন, বোরেক্স গরমে করলে তা থেকে বেরুবে সবুজ রঙের শিখা।

বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, প্রতি বস্তু গরম করলে তার শিখার নিজস্ব রঙ দেখা দেয়, যেমন সোডিয়াম। সোডিয়াম গরম করলে, একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় তা থেকে বেরিয়ে আসে পীত রঙ। সেজন্যেই লবণ অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইড গরম করলে দেখা যায় পীত রঙ। অনুরূপভাবে বোরোন বা বোরিক এ্যাসিড গরম করলে দেখা যাবে সবুজ রঙ।

অর্থাৎ কাঠের ভেতর বিভিন্ন উপাদানের যখন দহন হয় তখন বিভিন্ন রঙের শিখা দেখা যায়।

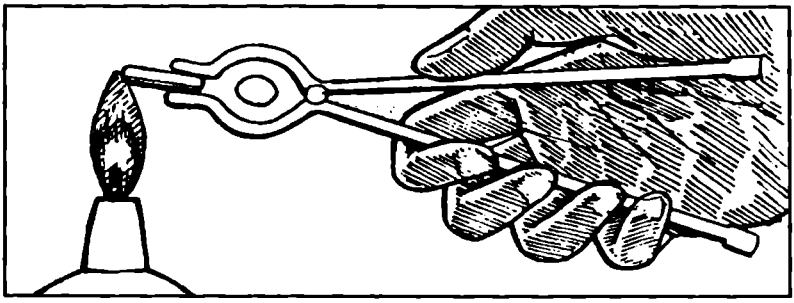

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, জ্বলন্ত কাঠের শিখার দিকে তাকালে নানা ধরনের রঙে আলোর শিখাগুলো কেন দেখা যায়।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ৪৮ আমরা জানি আলোকরশ্মি সরলরেখায় চলে। আর এই আলোকরশ্মির সরলরেখায় চলার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করা হয়েছে ক্যামেরা। কিন্তু আলোকরশ্মি যে সরলরেখায় চলে তা প্রমাণ কর?

উপকরণ : দু'টুকরো কার্ডবোর্ড (একটা একটু ছোট), আঠা লাগানো কাগজ (Wax paper), কসটেপ, আঠা, একটা টিনের পাত ও একটা মোমবাতি।

কার্যপ্রণালী : প্রথমে কার্ডবোর্ডগুদুটোকে মুড়ে দুটো বাক্স বানাতে হবে। জোড়া দেবার জন্য যে কোনো আঠা ব্যবহার করা যাবে। একদিক খোলা বাক্স দুটো এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে একটার ভেতর অন্যটা সহজে ঢুকে যেতে পারে। ছোট বাক্সে কোণা থেকে ৫ সেন্টিমিটার দূরে দুটো খাঁজ কেটে আঠা লাগানো কাগজের টুকরো সেখান দিয়ে ঢুকিয়ে দিতে হবে। এখন এই টুকরোটা সেই খাঁজে ঢুকিয়ে টান টান করে টেপ দিয়ে আটকে দিতে হবে। যদি ওয়াক্স পেপার না থাকে তাহলে এক টুকরো ঘষা কাঁচ অথবা ট্রেসিং পেপার হলেও চলবে। এখন টিনের পাত শক্ত করে বাক্সের একদিকে আটকে দিয়ে এতে একটা সূক্ষ্ম ছিদ্র করতে হবে। তারপর ছোট বাক্সটা বড় বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেই ক্যামেরা অর্থাৎ 'পিন-হোল ক্যামেরা' প্রস্তুত। এখন দেখতে হবে ক্যামেরাটা কাজ করে কি না। এবার মোমবাতিটা জ্বালিয়ে টিনের পাতের ছিদ্রের দিকে মুখ করে ক্যামেরা থেকে কিছু দূরে রাখতে হবে। এখন যদি উল্টো দিক থেকে দেখা যায় অর্থাৎ যেদিকে ওয়াক্স পেপার আছে তাহলে দেখা যাবে মোমবাতিটার উল্টো প্রতিচ্ছবি। কিন্তু প্রতিচ্ছবিটা কিভাবে তৈরি হল? আলোকরশ্মি সরলরেখায় চলে বলে প্রতিচ্ছবিটা তৈরি হল। এখানেও মোমবাতির সবদিক থেকে আলো সোজাভাবেই সেই ছিদ্রের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। অথএব মোমবাতির চারদিকের আলোর রশ্মি একযোগে প্রতিচ্ছবি তৈরি করছে। এটাই হল 'পিন-হোল ক্যামেরা' তৈরির নিয়ম। কিন্তু আমরা যে ক্যামেরা ব্যবহার করি সেখানে সূক্ষ্ম ছিদ্রের জায়গায় লেন্স ব্যবহার করা হয়। যদি ছিদ্রের জায়গায় একটু বড় আতস কাচ ব্যবহার করা হয় তাহলে অনেক পরিস্কার প্রতিচ্ছবি দেখা যাবে।

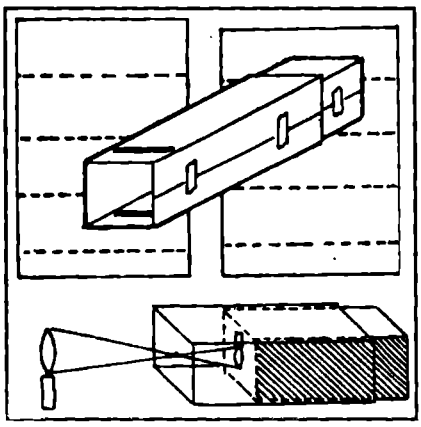

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, আলোকরশ্মি সরলরেখায় চলে এবং এই আলোক রশ্মির সরলরেখায় চলার শক্তির উপর ভিত্তি করে ক্যামেরা তৈরি হয়েছে।

www.pathagar.com

আমরা চোখে সবকিছু উল্টো দেখি–কথাটা শুনতে মজার হলেও সত্যি। আমরা কি সত্যিই উল্টো দেখি?

উপকরণ : একটা কনভেক্স লেন্স, ম্যাগনিফাইং গ্লাস ও সাদা কাগজ।

কার্যপ্রণালী : আমরা চোখে যে সবকিছু উল্টো দেখি এ কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য কনভেক্স লেন্স অর্থাৎ লেন্সের বর্হিদিকটা হবে সামান্য ফোলানো। এবার ঘর অন্ধকার করার জন্য দরজা জানালা বন্দ করতে হবে। তবে বাইরে থেকে যেন আলো আসতে পারে সে জন্য ছোট একটা পথ খোলা রাখতে হবে, যার ভেতর দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখা যাবে। অথবা জানালার কাচে একটু ফুটো করে নিতে হবে। এবার এক হাত দিয়ে ছিদ্রের সামনে ধরতে হবে লেন্সটা, অন্য হাত দিয়ে ধরতে হবে একটা সাদা কাগজ। কাগজের শিট লেন্সের সামনে ধরে আগেপিছে করতে থাকো, যতক্ষণ না কাগজের ওপর আবছা ছবি আসছে। এভাবে কাগজের সঙ্গে লেন্সের দূরত্ব এমনভাবে রাখতে হবে, যাতে ছবি স্পষ্ট হয়।

এবার মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে হবে যে ছবি দেখা যাচ্ছে, সেটা কিসের ছবি? হ্যাঁ, বাইরের দৃশ্য, কিন্তু উল্টো দেখা যাচ্ছে, তাই না? আকাশটা নিচে, গাছপালা ওপরে। রাস্তার মানুষগুলো যাচ্ছে, পা ওপরে, মাথা নিচে। কেন হচ্ছে? উত্তরটা সহজ–কনভেক্স লেন্সের মধ্য দিয়ে কোনো আলো গেলে, তার সামনের বস্তুর ছবি উল্টোভাবে দেখা যায়।

আমাদের চোখও এই ধরনের লেন্স দিয়ে তৈরি। বস্তু থেকে আসা আলো চোখে প্রবেশ করে, লেন্সের ভেতর দিয়ে গিয়ে অক্ষিগোলকের পেছনের দিকে, অর্থাৎ রেটিনায়, উল্টো অবস্থায় দৃশ্য হয়। কিন্তু আমাদের মস্তিষ্কের অপটিক নার্ভের বিস্তারিত বিষয়ের ভিত্তিতে রেটিনার ওপর দৃষ্ট উল্টো ছবিকে সোজা এবং স্বাভাবিকভাবে দেখতে সাহায্য করে।

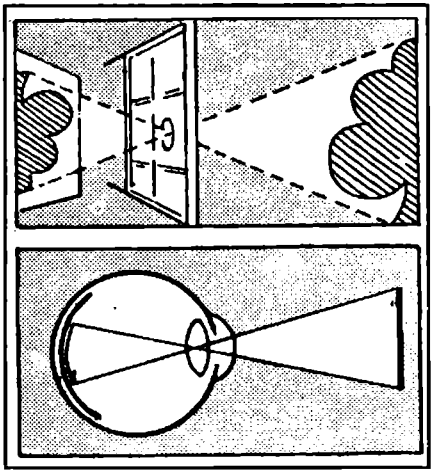

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, আমরা চোখে সবকিছু উল্টো দেখি, কিন্তু আমাদের মাথার অপটিক নার্ভের দৃষ্ট উল্টো ছবিকে সোজা এবং স্বাভাবিকভাবে দেখতে সাহায্য করে।

www.pathagar.com

প রী ক্ষা ৫০

আয়না ও ছবির মধ্যের দূরত্ব, আয়না ও বস্তুর দূরত্বের সমান। প্রমাণ কর?

উপকরণ : এক শিট সাদা কাগজ, একটা আয়না, কিছু পিন, একটা পেন্সিল ও একটা স্কেল।

ব্যাখা : একটা বড় আয়নার সামনে দাঁড়ালে দেখা যাবে নিজের ছবি। শুধু তাই নয়, আয়নার যত কাছে যাওয়া হবে, নিজের ছবিও আয়নার তত কাছে সরে আসবে। দূরে গেলে দেখা যাবে আয়না থেকে নিজের ছবির দূরত্বও বেড়ে গেছে। কিন্তু কেন?

কার্যপ্রণালী : সাদা কাগজের শিটটা টেবিলের ওপর বিছিয়ে ঠিক মাঝখান বরাবর একটা লাইন টেনে তার ওপর বসাতে হবে আয়না, কোনো কিছুতে ঠেস দিয়ে। এবার আয়নার সামনে একটা পিন 'পি' আটকাতে হবে এবং ডানদিকে আরেকটা পিন দিয়ে 'এ' আটকাতে হবে। আরো একটা পিন 'বি' বসাতে হবে–প্রতিচ্ছবি 'পি' যে রেখায় 'এ'-এর সঙ্গে মিলিত হচ্ছে সেই লাইনে। এখন বাঁদিকেও ২টি পিন 'সি' ও 'ডি' আটকাতে হবে পূর্বের মতো।

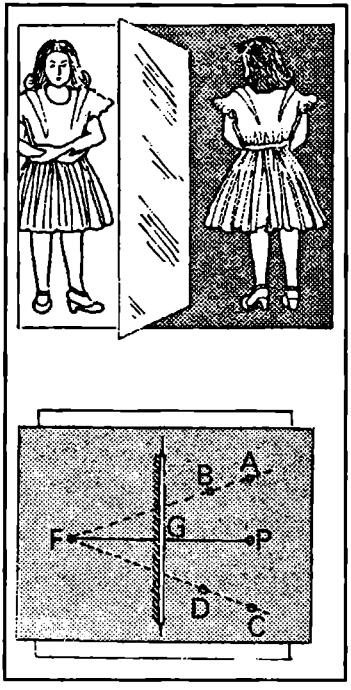

এবার আয়নাটা সরিয়ে এবং রেখাচিত্রে যেভাবে দেখানো হয়েছে, সেভাবে পিনগুলির অবস্থাগুলোকে মুক্ত করতে হবে। 'এ'-কে যুক্ত করতে হবে 'বি'-এর সঙ্গে এবং 'সি'-কে যুক্ত করতে হবে 'ডি'-এর সঙ্গে। এবং সেই লাইনকে সম্প্রসারিত করে যুক্ত করতে 'এফ'-এর সঙ্গে। এই রেখা আয়নার অবস্থান বিন্দুকে 'জি'-তে ছেদ করবে। এবার মাপ নিলে দেখা যাবে, জি ও পি-এর দূরত্ব জি ও এফর-এর দূরত্বের সমান। এ থেকে প্রমাণিত হয়, প্রতিচ্ছবি ও আয়নার দূরত্ব, বস্তু ও আয়নার দূরত্বের সমান।

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, আয়না ও ছবির মাঝের দূরত্ব, আয়না ও বস্তুর দূরত্বের সমান।

www.pathagar.com

প রী ক্ষা ৫১

আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজের ছব দেখা যায়, কিন্তু এমন অনেক কিছুই আয়নার ভেতরে দেখা যায়, যা আয়নার সামনে নেই। কেন এমন হয়?

উপকরণ : রাবারের একটা বল, একটা টর্চ লাইট, একটা আয়না।

ব্যাখা : আমরা কোনো জিনিস দেখতে পাই তখন, যখন কোনো আলোকরশ্মি বস্তুর ওপর পড়ে আমাদের চোখে পৌঁছায়। বস্তুর ওপর পড়ে আলোকরশ্মির গতিপথ পরিবর্তিত হলে, তাকে বলা হয় প্রতিফলন।

কার্যপ্রণালী : প্রথমে রাবারের বলটা খাঁড়াভাবে মাটিতে আঘাত করলে দেখা যাবে, বলটি খাঁড়াভাবেই নিজের হাতে উঠে আসছে। কিন্তু নিজের থেকে একটু দূরে অর্থাৎ কিছুটা তেরছাভাবে বলটি মাটিতে নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে বলটি নিজের কাছে ফিরে আসছে না। এভাবের বারংবার করতে থাকলে দেখা যাবে, বলটি কোণাকুণিভাবে মাটি স্পর্শ করছে। আর সেভাবেই সে অপরদিকে উঠে আসছে।

এবার আয়নার সামনে সোজাসুজি একটা টর্চলাইট ধরলে দেখা যাবে, আলোকচ্ছটা প্রতিবিম্বিত হয়ে একই পথে ফিরে আসছে। কিন্তু টর্চলাইটটা একটু তেরছাভাবে ধরলে দেখা যাবে, তা অন্য পথে অর্থাৎ অপরদিকে সরে গেছে তবে আয়না থেকে একই সমকোণে।

আয়নাতে নিজেকে দেখা যায় তখনই, যখন নিজের শরীর থেকে আলো খাঁড়াভাবে আয়নায় পড়ে বা প্রতিবিম্বিত হয়। এবং এটা সম্ভব হয় আয়নার সামনা-সামনি দাঁড়ালেই। কিন্তু আয়নার সামনে না দাঁড়িয়েও যেসব জিনিস দেখা যায়, তা থেকে আলো কোণাকুণি আয়নার আঘাত করে এবং আমাদের চোখে পৌঁছায়।

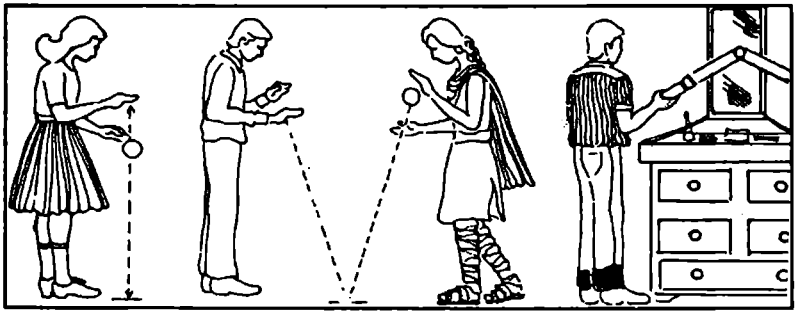

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজেকে যেমন দেখা যায় তেমনি অন্য অনেক জিনিসও দেখা যায়, যেসব জিনিস থেকে আলো কোনাকুণিভাবে আয়নায় এসে প্রতিবিম্বিত হয়ে এবং আমাদের চোখে ধরা দেয়।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ৫২

টেলিস্কোপ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা দূর আকাশের অনেক কিছু দেখতে পাই। কিন্তু কীভাবে?

উপকরণ : ঘরে বসে দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করতে দরকার দুটি ভিন্ন ভিন্ন পাওয়ারের ম্যাগনিফাইং গ্লাস বা অতসী কাঁচ, একটা খোলা বই, শক্ত কাগজের দুটি শিট।

ব্যাখা : দূরবীক্ষণ বা টেলিস্কোপ এমন একটা যন্ত্র যার সাহায্যে দূরের বস্তু নিকটে এবং বড় আকারে দেখা যায়। টেলিস্কোপে দূর আকাশের আনন্দ দেখার জন্য ঘরে বসে নিজেই টেলিস্কোপ তৈরি করা যায়।

কার্যপ্রণালী : প্রথমে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দুটো নাও। গ্লাসের শক্তি পরীক্ষার জন্য একটা খোলা বইয়ের সামনে গ্লাস দুটি ধরতে হবে। যে কাঁচের অক্ষরগুলো অন্য কাঁচের অপেক্ষা বড় দেখাবে সেটার শক্তি বেশি এবং স্বাভাবিকভাবে অন্য কাঁচটির শক্তি কম হবে। এখন, কম শক্তির কাঁচটি চোখ থেকে ৫ সেন্টিমিটার দূরে রেখে তার সামনে ধরতে হবে বেশি শক্তির কাঁচ। কাঁচ দুটি এমনভাবে ধরতে হবে যাতে দূরের জিনিস পরিষ্কার দেখা যায়। দূরের বস্তু বড় ও নিকটেই শুধু দেখা যাবে না, দেখা যাবে উল্টোভাবে। এবার দুই কাঁচের মধ্যকার দূরত্ব মাপতে হবে।

এবার টেলিস্কোপ বানানোর জন্য দুই কাঁচের অবস্থান বা পজিশনকে অপরিবর্তিত রেখে শক্ত কাগজের দুটি শিট নিতে হবে। কাগজটি ভাঁজ করে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের প্রায় সমান ব্যাসের দুটি টিউব তৈর করতে হবে। ছোট ব্যাসের টিউবের ওপরে কিছুটা বাড়তি কাগজের মোড়ক দিতে হবে, যাতে বড় টিউবের মধ্যে ছোট টিউবটি সহজে প্রবেশ করানো যায়। মনে রাখতে হবে, দুটি লেন্সের দূরত্বের চেয়ে টিউবের দৈর্ঘ্য যেন অন্তত ৫ সেন্টিমিটারের বেশি হয়। দ্বিতীয় টিউবের দৈর্ঘ্য হবে প্রথম টিউব থেকে কম। এখন, এখন একটা টিউব অন্যটার মধ্যে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে দূরের জিনিস বড় ও স্পষ্ট দেখা যায়।

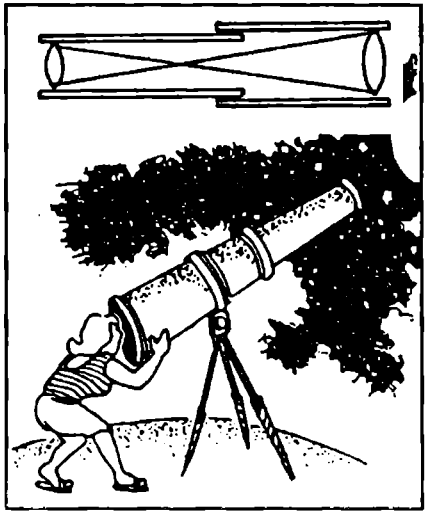

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দূরের জিনিসকে কাছে এবং বড় করে দেখা যায়।

www.pathagar.com

পানি ভর্তি একটা পাত্রের গভীরতা ওপর থেকে দেখলে প্রকৃত গভীরতা থেকে কম মনে হয়। কিন্তু কেন এমন মনে হয়?

উপকরণ : অগভীর একটা পাত্র বা বাটি, একটি এক টাকার কয়েন এবং পানি।

কার্যপ্রণালী : প্রথমে পাত্রটি একটি টেবিলের ওপর রাখতে হবে এবং পাত্রটির ভেতর কয়েনটি রাখতে হবে। এবার উঁচু থেকে কয়েনটি দেখতে হবে, তারপর ধীরে ধীরে মাথাটি নামিয়ে এনে এমন একটি জায়গায় স্থির রাখতে হবে, যেখান থেকে কয়েনটা দেখা যাবে না। বাটির কিনারায় সম্পূর্ণ আড়ালে চলে যাবে। এ অবস্থায় মাথাটা রেখে, কাউকে বাটির ধার বেয়ে ধীরে ধীরে বাটিতে পানি ঢালতে, যাতে কয়েনটা সরে না যায়। বাটির তলায় পানি আসার সঙ্গে সঙ্গে একই অবস্থানে থেকে কয়েনটা আবার দেখা যাবে। একটু আগে যেটা দেখা যাচ্ছিল না, একই অবস্থানে থেকে এখন কীভাবে তা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে?

এটা বুঝতে আমাদের জানতে হবে আমরা কোনোকিছু দেখি কিভাবে? আলোর উৎস থেকে আলোকরশ্মি কোনো বস্তুতে প্রতিফলিত হয়ে যখন আমাদের চোখে পৌঁছায় তখনই আমরা দেখতে পাই। কিন্তু আলো যখন একমাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করে, তখন তার গতিপথ পরিবর্তিত হয়–একই পথে যায় না। এই পরিবর্তনকে বলে আলোর প্রতিসরণ। এই প্রতিসরণের নিয়ামানুষারেই পানিপূর্ণ বাটির তলাটা মনে হয় কিছুটা ওপরের দিকে উঠে এসেছে। এই একই কারণে পানিভর্তি গ্লাসে রাখা টুথব্রাশকে মনে হবে পানির উপরিভাগের বিন্দু থেকে বেঁকে গেছে।

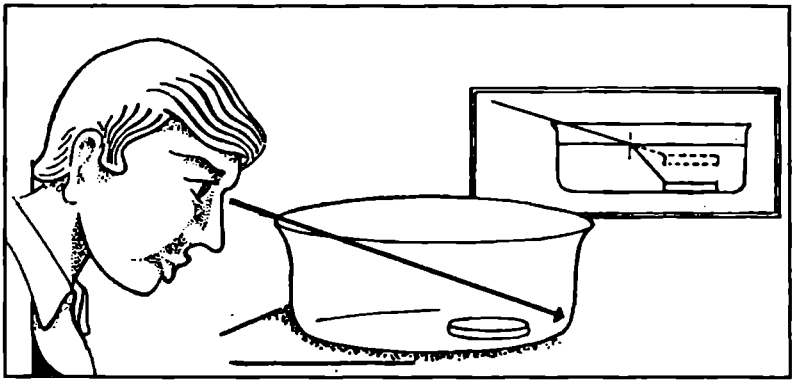

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, কেন পানি ভর্তি একটা পাত্রের গভীরতা ওপর থেকে দেখলে প্রকৃত গভীরতা থেকে কম মনে হয়।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ৫৪

কোনো বস্তুকে তখনই দেখা যায়, যখন তা থেকে প্রতিফলিত আলো চোখে এসে পড়ে। কিন্তু সবকিছুতেই যদি আলো প্রতিফলিত হয়, তাহলে সব বস্তুতে আয়নার মতো প্রতিফলন হয় না কেন?

উপকরণ : একটা আয়না, একটা টর্চ লাইট এবং এক শিট সাদা কাগজ।

কার্যপ্রণালী : ঘরের সব জানালা দরজা বন্ধ করে সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরের দেয়াল ঘেঁষে একটা টেবিল নিয়ে তার ওপর একটা আয়না রাখতে হবে। এখন একটা টর্চ জ্বেলে আয়নার ওপর তার রশ্মি ফেলতে হবে। দেখা যাবে, আলোর ছটা আয়নায় প্রতিফলিত হবে। এবং পরিষ্কার দেখা যাবে, প্রতিফলিত সেই আলো আয়নার সঙ্গে একটা সমকোণ তৈরি করেছে।

এখন আয়না সরিয়ে এক শিট সাদা কাগজ রেখে তার ওপর টর্চের আলো ফেলতে হবে। কিন্তু একটা আলোর আভা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাবে না। আয়নার মতো প্রতিফলিত রশ্মি দেখা যাবে না। কিন্তু কেন? আসলে কাগজের ওপর আলোর প্রতিফলন সমানভাবে হয় না, কারণ কাগজের উপরিভাগ মসৃণ নয়। কাগজের পৃষ্ঠদেশ অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে, কেন কাগজের ওপর আলো অসমান বা এলোমেলোভাবে প্রতিফলিত হয়।

কাগজের উপরিভাগ যদি মসৃণও হয়, তাহলেও কাগজের সূক্ষ্মতম অসমান খাঁজগুলি আলোক রশ্মি প্রতিফলনে বাধা সৃষ্টি করে। যেহেতু আয়নার উপরিভাগ অত্যন্ত মসৃণ, তাই তাতে আলো পড়লেই সমানভাবে এদিক ওদিক না ছড়িয়ে প্রতিফলিত হয়। সেজন্য সেই প্রতিফলন খুবই পরিষ্কার এবং তীব্র। অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রেও যদি প্রতিফলিত রশ্মির অপচয় ঘটে, তাহলেও তা ঝকঝকে প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করবে না।

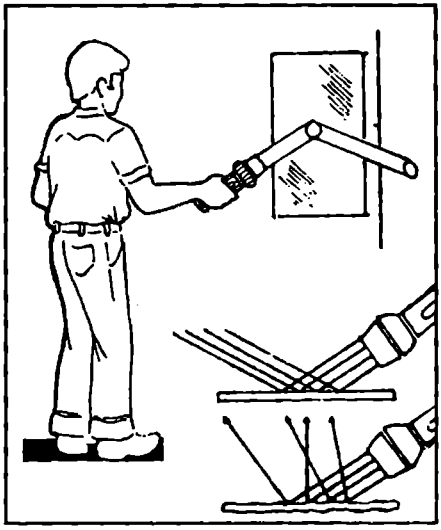

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, কোনো বস্তু থেকে যখন আলো প্রতিফলিত হয় তখনই তা দেখা যায় কিন্তু সব বস্তুতে আলোর প্রতিফলন আয়নার মতো হয় না কেন।

www.pathagar.com

সূর্যের আলোয় সাত রঙের সমাহার, বা রঙধনুতে সাত রঙ–এ কথা কি সত্যি? রঙধনুর আলো কিভাবে দেখা যায়।

উপকরণ : এক গ্লাস পরিষ্কার পানি, একট টুকরো সাদা কাগজ।

কার্যপ্রণালী : এক গ্লাস পরিষ্কার পানি জানালার ধারে রাখতে হবে, যাতে সূর্যের আলো তার ওপর সরাসরি পড়ে। এখন গ্লাসের নিচে এক টুকরো সাদা কাগজ রাখলে দেখা যাবে রঙধনুর সাতটি রঙ। রঙগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তা বেগুনি, বেগুনি নীল, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল। রঙগুলির ক্রম সাজানো আছে সেভাবে যেভাবে রঙধনুতে থাকে।

রঙধনু আকাশে অথবা কাগজে যেখানেই দেখা যাক–এদের কার্যকারণ সূত্র একটাই। সেটা হলো, আলোর প্রতিসরণ নীতি। যখন আলো এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যায়, তখন তা মূল পথ থেকে কিছুটা সরে যায়। এই প্রতিসরণের সঙ্গে সঙ্গেই আলোর অন্তর্নিহিত সব রঙ মৌলিক নীতি অনুসারে বিভিন্ন দিকে সরে যায়, অর্থাৎ আলো সাতটি রঙে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বায়ু, পানি, গ্লাস ইত্যাদি হলো ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যম। এক মাধ্যম থেকে যখন আলো অন্য মাধ্যমে যায়, তখন আলোর প্রতিসরণ ঘটে।

বাতাসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আলো গ্লাসের পানিতে গিয়ে পড়ে। সেখান থেকে আলো বেরিয়ে আবার বাতাসের মধ্য দিয়ে কাগজে পড়ে। এই প্রতিসরণের ফলেই সৃষ্টি হয় রঙধনু। এভাবেই বৃষ্টির সময় সূর্যরশ্মি মেঘের জলকনার সংস্পর্শে এসে রঙধনুর সৃষ্টি করে।

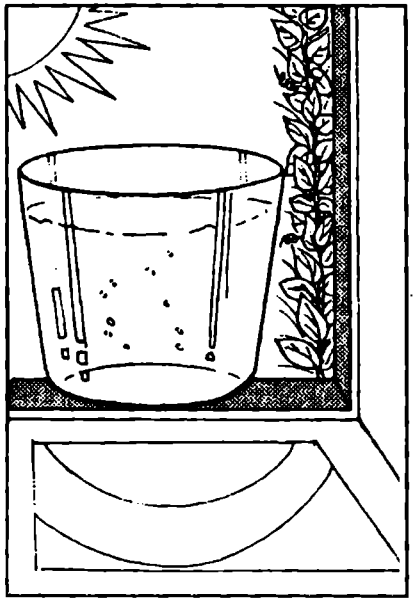

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, সূর্যের আলোয় এবং রংধনুতে সাতটি রঙের সমাহার এবং আলোর প্রতিসরণের ফলে সৃষ্টি হয় রঙধনু। বৃষ্টির সময় সূর্যরশ্মি যখন মেঘখণ্ডে জমা বিন্দু বিন্দু পানিকনার সংস্পর্শে আসে তখনই আকাশে দেখা যায় রঙধনু।

www.pathagar.com

প রী ক্ষা ৫৬

বড় গোলাকার চাকতি স্থির অবস্থায় নানা বর্ণের দেখা যায়, কিন্তু ঘুরন্ত অবস্থায় তা সম্পূর্ণ সাদা দেখায়—কেন?

উপকরণ : এক শিট পিচবোর্ড, লাল, কমলা,হলুদ, সবুজ, নীল ও বেগুনি রঙের কালার পেনসিল এবং একটা কাঠপেনসিল।

কার্যপ্রণালী : প্রথমে নিচের ছবির মতো একটা চাকতি বানাতে হবে। এজন্য পিচবোর্ডের শিটকে ১০ সেন্টিমিটার ব্যাসে গোল চাকতি করে কাটতে হবে। চাকরিত উপরিভাগকে সমান ৬টি ভাগে ভাগ করতে হবে। সেই ভাগগুলোকে ক্রমানুসারে লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ, নীল ও বেগুনি রঙের কালার পেনসিল দিয়ে ভরাট করতে হবে। কিছুক্ষণ পর রঙটা শুকিয়ে গেলে, চাকতির মাঝখানে একটা ফুটো করে ৫ সেন্টিমিটার লম্বা পেনসিল বা পুরোনো পেন্টিং ব্রাসের হ্যান্ডেল ঢুকিয়ে দিলেই তৈরি হয়ে যাবে চাকতি। এখন হ্যান্ডেলের সাহায্যে চাকতিটা জোরে ঘুরিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। পেন্সিল পয়েন্টে চাকতিটা ঘুরবে। আর চাকতিটা জোরে ঘুরতে শুরু করলেই দেখা যাবে অবাক কাণ্ড। রঙিন চাকতিটা এখন রঙবিহীন সাদা চাকতিতে পরিণত হয়ে ঘুরছে।

আসলে যা হচ্ছে, তা হলো–চাকতিটা যখন জোরে ঘুরছে, তখন আমাদের চোখ রঙগুলোকে আলাদা আলাদা ভাবে চিনে নিতে পারে না। আমরা দেখতে পাই সব রঙের সম্মিলিত প্রতিচ্ছবি, কারণ এই রঙগুলি হচ্ছে সেইসব রঙ যা সূর্যরশ্মিতে নিহিত থাকে। কাজেই তাদের দৃষ্টিগ্রাহ্যতা সূর্যালোকের মতোই হবে–হয় রঙহীন বা সম্পূর্ণ সাদা। এ জন্যই স্থির অবস্থায় চাকতি রঙিন হলেও আপন অক্ষে ঘুরন্ত অবস্থায় তা দেখতে লাগে সাদা।

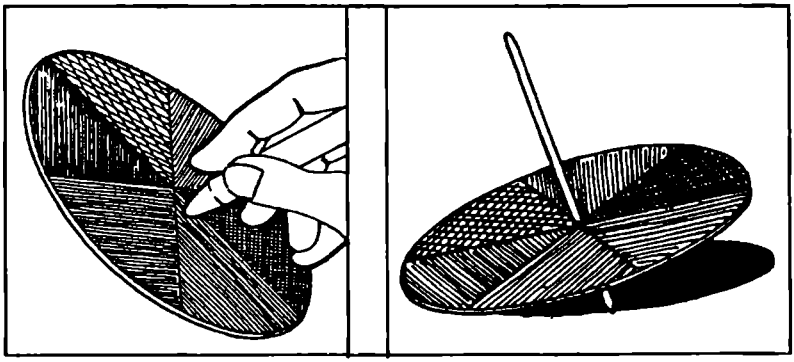

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, রঙিন গোলাকার চাকতি স্থির অবস্থায় রঙিন দেখালেও নিজ অক্ষের চারদিকে ঘুরন্ত অবস্থায় তা সম্পূর্ণ সাদা দেখায়।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ৫৭

পৃথিবীর চারপাশে তাকালে দেখা যাবে নানান রঙের বাহার। কিন্তু এত রঙ কোথা থেকে আসে আর কিভাবে এত রঙ সৃষ্টি হয়?

উপকরণ : একটা টর্চ লাইট, কয়েক শিট বিভিন্ন রঙের মসৃণ কাগজ আর এক শিট সাদা কাগজ।

কার্যপ্রণালী : প্রথমে পরীক্ষার জন্য ঘরটা সম্পূর্ণভাবে অন্ধকার করে নিতে হবে। তারপর টেবিলের একটা লাল কাগজের শিট বিছাতে হবে। এবার বিছানো লাল কাগজের ধারে সাদা কাগজের শিটটা সামান্য বাঁকা করে (ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে) ধরতে হবে। এবার অন্য দিক থেকে লাল কাগজের ওপর টর্চের আলো ফেলতে হবে। দেখা যাবে সাদা কাগজে লাল রঙের আভা পড়েছে। নিচের লাল কাগজের রঙের আভায় সাদা কাগজ লালচে হয়ে উঠেছে। এবার লাল কাগজের পরিবর্তে নিচে সবুজ কাগজ রেখে আগের মতোই টর্চের আলো ফেলতেই দেখা যাবে সাদা কাগজে সবুজ রঙের আভা। এইভাবে সব কাগজই তার নিজস্ব রঙ ছড়িয়ে দেয়, বা প্রতিফলিত করে।

এর অর্থ হলো, কোনো বস্তু আলোর মধ্যে বর্তমান অন্য সব রঙ ধরে রাখতে পারে, শুধু নিজেরটা ছাড়া, যা সে কেবল প্রতিফলিত করে। অন্যভাবে বলা যায়, অন্য সব রঙকে বস্তু অন্তর্ভুক্ত করে।

ঘাস সবুজ দেখায়, কারণ আলো প্রতিফলনের আগে সব রঙই সে গ্রহণ করে, শুধু নিজের সবুজ রঙ ছাড়া। এভাবে প্রতিফলনে পর শুধু সবুজ রঙটাই আমাদের চোখে দেখা যায়। তাই ঘাস সবুজ দেখায়। আপেলের লাল রঙ, কমলালেবুর হলুদ রঙ–সব রঙের গোপন রহস্যই এক। বেশ মজার, তাই না?

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, পৃথিবীতে এতো নানা রঙের সমাহার কোথা থেকে আসে কিভাবে আসে।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ৫৮

আলোর প্রতিফলন ও রঙের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে—কি সম্পর্ক?

উপকরণ : ১৫ সেন্টিমিটারের একটি বর্গকার দুটি কাগজের শিট। একটার রঙ কালো এবং অন্যটা সাদা রঙের। আর একটা টর্চ লাইট।

কার্যপ্রণালী : প্রথমে সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে টেবিলেল ওপর কালো কাগজের শিট বিছিয়ে তার ওপর টর্চের আলো ফেলতে হবে। দেখা যাবে ঘরটা বেশ আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে। এবার একইভাবে সাদা কাগজের শিট টেবিলে বিছিয়ে তাতে টর্চের আলো ফেললে দেখা যাবে ঘরটা আগের চেয়ে অনেক বেশি আলোকিত হয়েছে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সাদা কাগজে আলোর প্রতিফলন অনেক বেশি জোরালো।

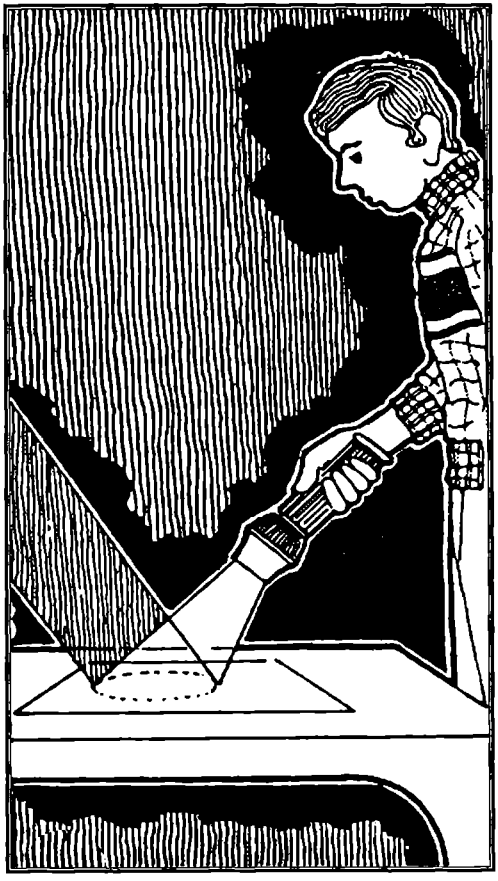

অন্যান্য রঙের কাগজের ওপরও এই ধরনের পরীক্ষা চালিয়ে দেখা যেতে পারে। এছাড়া মসৃণ ও অমসৃণ তলদেশেও এই পরীক্ষা পূনর্বার করে দেখা যেতে পারে। দেখা যাবে ফলাফলে অনেক পার্থক্য।

মসৃণ এবং হালকা রঙের উপরিভাগে আলোর প্রতিফলন, গাঢ় ও অমসৃণ উপরিভাগের তুলনায় অনেক বেশি। কাজেই আলো প্রতিফলনের সঙ্গে রঙের সম্পর্ক আছে।

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, আলোর প্রতিফলনের ক্ষেত্রে যেখানে আলো প্রতিফলিত হচ্ছে সেখানার রঙের সাথে একটা সম্পর্ক আছে।

www.pathagar.com

গ্রীষ্মকালে আমরা হাল্কা রঙের পোশাক ব্যবহার করি কেন?

উপকরণ : দুটি টেস্টটিউব, ঠাণ্ডা পানি, এক টুকরো সাদা কাগজ ও এক টুকরো কালো কাগজ।

কার্যপ্রণালী : প্রথমে টেস্টটিউব দুটি ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ভর্তি করে নিতে হবে। ঠাণ্ডা পানির তাপমাত্রা দেখে নিতে হবে। এখন একটা টেস্টটিউব সাদা কাগজ দিয়ে এবং অপরটা কালো কাগজ দিয়ে মুড়ে দিতে হবে। এবার দুটি টেস্টটিউবকে রোদ্দুরে ঘণ্টাখানেক রেখে দিতে হবে।

ঘণ্টাখানেক পর দুটি টেস্টটিউবের তাপমাত্রা মেপে দেখা যাবে তাপমাত্রার কত তফাৎ। অথচ প্রথমে দুটি টেস্টটিউবের তাপমাত্রা ছিল একই এবং রোদে রাখা হয়েছিল একই সঙ্গে একই স্থানে। তাপমাত্রায় আকাশ-পাতাল পার্থক্যের আসল কারণ সাদা ও কালো কাগজের মোড়ক।

সাদা কাগজে পড়া রোদ প্রতিফলিত হয়ে বেরিয়ে যায়। অন্যদিকে কালো কাগজে পড়া রোদের বেশিরভাগটা সে শুষে নেয়। শুষে নেওয়া রোদ তাপে কালো কাগজে মোড়া টেস্টটিউবের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং সাদ কাগজে মোড়া টেস্টটিউবে রোদ তাপের অধিকাংশ ভাগই প্রতিফলিত হয়, তাই তাপমাত্রা কম হয়। এ কারণেই গরমকালে আমরা সাদা বা হাল্কা রঙের জামাকাপড় বেশি পরি।

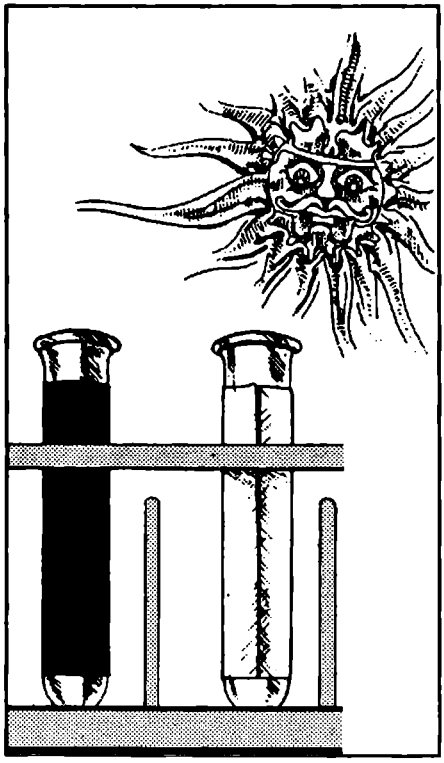

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, গরমকালে আমরা হালকা রঙের জামা কাপড় পরি, কারণ গাঢ় রঙে সূর্যের তাপ শোষিত হয় বেশি, আর গাঢ় রঙের কাপড় গরমকালে পরলে অস্বস্থি হয়।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ৬০

সিনেমার পর্দা অর্থাৎ একটা সাদা কাপড়ের উপর কিভাবে সিনেমার ছবিগুলো দেখা যায়?

উপকরণ : একটা সাদা প্যাড বা নোটবুক আর একটা কলম।

কার্যপ্রণালী : প্যাডের শেষ পাতার ডান দিকের নিচে কলম দিয়ে বড় একটা বিন্দু করতে হবে। পরের পাতাতেও অনুরূপ বড় একটা বিন্দু দিতে হবে তবে একই জায়গায় নয়–আগের পাতার বিন্দুর সামান্য বামদিকে। এভাবে প্রতি পাতায় একই ধরনের বিন্দু দিতে হবে। তবে প্রত্যেক পাতার বিন্দু, তার আগের পাতার বিন্দুর সামান্য বামদিক ঘেঁষে হবে। এইভাবে বিন্দু দিতে দিতে যখন প্রথম পাতায় এসে পৌছাবে তখন পরীক্ষার প্রস্তুতিপর্ব শেষ হবে। এবার পরীক্ষা শুরু করা যাক।

প্যাড বা নোটবুকটা বাঁহাতে এমনভাবে ধরতে হবে যাতে বুড়ো আঙুল দিয়ে পাতাগুলো মুড়ে রাখা যায়। এবার পাতাগুলো দ্রুত একটার পর একটা ছাড়তে হবে। কি দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে বিন্দুগুলো আলাদা আলাদা নেই। পরিবর্তে মনে হবে একটা বিন্দুই ডানদিক থেকে বাঁদিকে সরে যাচ্ছে। আমরা যখন কোনো জিনিস দেখি, সেই জিনিসের প্রতিচ্ছবি আমাদের চোখের পর্দায় অর্থাৎ রেটিনায় পড়ে। এই প্রতিচ্ছবি চোখের পর্দায় থাকে এক সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময় পর্যন্ত–এমনকি বস্তু থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেও। আমাদের চোখের এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের সুযোগ নিয়ে বিজ্ঞানীরা সিনেমা তৈরি করেন। প্রথম প্রতিচ্ছবির রেশ সম্পূর্ণ শেষ হবার আগেই পরের প্রায় একই রকম ছবি চোখের রেটিনায় পড়ে। তারপর তৃতীয় ছবি, চতুর্থ ছবি–এইভাবে পর পর ছবি একইভাবে আসতে থাকে। ছবিগুলো এত দ্রুত আসে যে আমাদের চোখ প্রতিটি ছবি পৃথক পৃথকভাবে দেখতে পায় না। চোখ দেখতে পায় তার সম্মিলিত প্রতিচ্ছবি যেটা চলমান ছবির মতো ভেসে ওঠে চোখে।

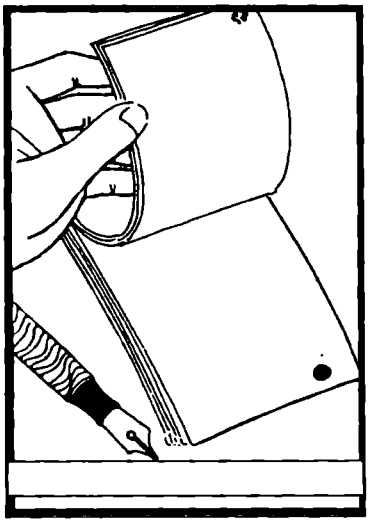

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, সিনেমার পর্দায় বা সাদা কাপড়ের পর্দায় কিভাবে সিনেমার ছবিগুলো দেখা যায়।

www.pathagar.com

সাধারণ একটা সুচকে কি চুম্বকে পরিণত করা যায়?

উপকরণ : একটা সাধারণ সুচ, এক খণ্ড চুম্বক, কিছু আলপিন।

কার্যপ্রণালী : প্রথমে এক হাতে সুচ, অন্য হাতে চুম্বকের ডগাটা ধরে সুচের ডগা থেকে ঘষে ঘষে নিচের দিকে নিয়ে আসতে হবে। চুম্বকের ডগাটা আবার তুলে সুচের ডগায় নিয়ে যেতে হবে এবং একইভাবে নিচের দিকে টেনে নিতে হবে। এভাবে বারংবার–অন্ততঃ ৭০-৭৫ বার কিংবা আরো বেশি করলে সুচটি চুম্বকে পরিণত হবে। এ ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, চুম্বক খণ্ডটি প্রতিবার একদিক থেকেই ঘষে নামাবে। অনেকবার করার পর সুচ চুম্বকে পরিণত হয়েছে কিনা দেখার জন্য সুচের কাছে একটা আলপিন ধরলে যদি সুচ তা আকর্ষণ করে, তাহলে বুঝতে হবে সুচটি চুম্বকে পরিণত হয়েছে।

এখন এই সুচের সাহায্যে একটা কম্পাসও তৈরি করা যায়।

একটা কর্ক নিয়ে পানির ওপর ভাসাতে হবে। এবার সুচটা কর্কের মাঝখানে দিয়ে এমনভাবে প্রবেশ করাতে হবে যাতে সুচের উভয়প্রান্ত কর্ক থেকে সমান্তরালভাবে বেরিয়ে থাকে। আর এটায় হলো কম্পাস।

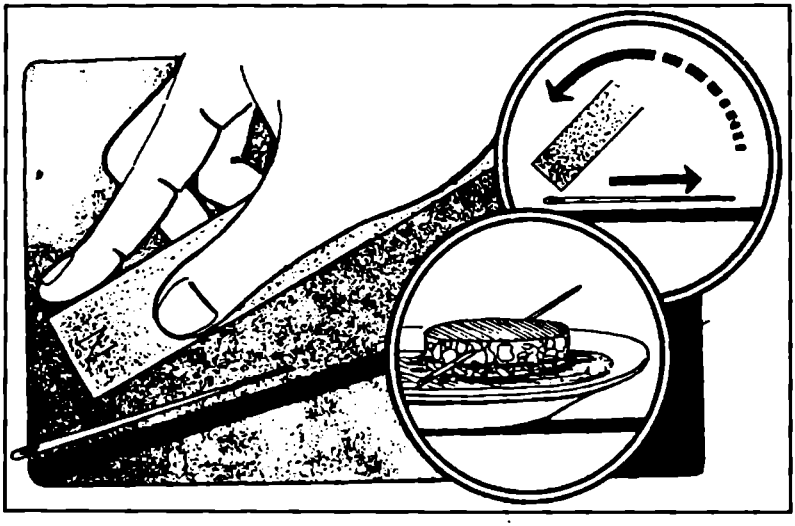

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, একটা সাধারণ সুচকে একটা চুম্বক দ্বারা একই দিক থেকে ঘষে ঘষে চুম্বকে পরিণত করা যায় এবং সেই সুচ দিয়ে একটা কম্পাসও তৈরি করা যায়।

www.pathagar.com

প রী ক্ষা ৬২

দিক নির্ণয়ের জন্য একটা যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, যার নাম কম্পাস। কিভাবে একটা কম্পাস তৈরি করা যায় এবং তা কিভাবে কাজ করে?

উপকরণ : একটা লম্বা সুচ, লম্বা এক খণ্ড চুম্বক, একটা বোতলের কর্ক, এক টুকরো কাগজ ও সুতো।

কার্যপ্রণালী : প্রথমে চুম্বকের উত্তরমেরুর দিকটা সুচের মাঝখান থেকে ঘষে সুচের ছিদ্রমুখের দিকে নিয়ে যেতে হবে। আবার চুম্বকখণ্ডটি তুলে সুচের আগের বিন্দুতে নিয়ে আসতে হবে এবং একইভাবে একই দিক থেকে ঘষে নামাতে হবে। এভাবে বারবার চুম্বকখণ্ডটি একইভাবে সুচের গায়ে ঘষলে সুচটি চুম্বকে পরিণত হবে। এরপর চুম্বকখণ্ডের দক্ষিণমেরুর প্রান্তটা সুচের মাঝ বরাবর রেখে সুচের সরু বা ছুঁচালো মুখের দিকে ঘষে নামাতে হবে। একটা জিনিস অবশ্যই মনে রাখতে হবে, উত্তর বা দক্ষিণ যে মেরু দিক দিয়েই ঘষে নামানো হোক না কেন, প্রতিবার চুম্বকটি যথেষ্ট উপরে তুলে সেই বিন্দুতে এনে তবেই আবার ঘষে নামাতে হবে। নাহলে সুচটি ঠিকমতো চুম্বক শক্তি পাবে না।

এবার বোতলের কর্কটা নিয়ে তার সাহায্যে তৈরি করতে হবে একটা দোলনা। কাগজ ভাঁজ করে সুতো দিয়ে একটা দোলনা তৈরি করে কর্কের সঙ্গে ড্রয়িং পিন দিয়ে ছবির মতো করে আটকে দিতে হবে। এবার সাবধানে কাগজের ভাঁজ বরাবর সুচটি রাখতে হবে এবং এ অবস্থায় সমগ্র জিনিসটি বোতলের ভেতরে ঝুলিয়ে দিতে হবে। বোতলের মুখে শক্ত করে কর্ক আটক দিতে হবে। এবার দেখা যাবে সুচটি চৌম্বক শক্তিপ্রাপ্ত হওয়ায় কোনো বাধা পাবে না এবং তা অবাধে ঘুরে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু প্রান্ত নির্ণয় করতে পারবে।

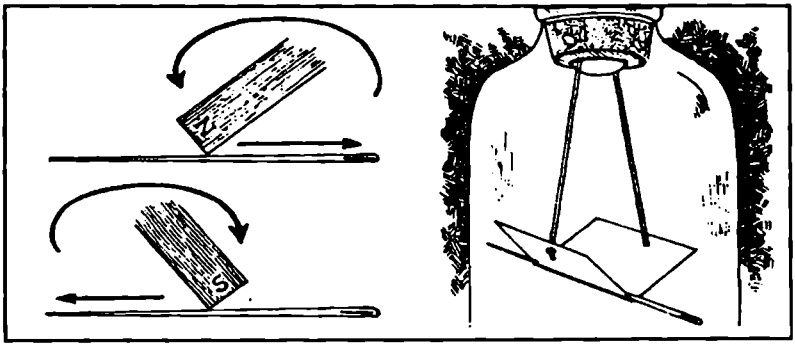

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, একটা সাধারণ সুচকে চুম্বকে পরিণত করে তা থেকে দিক নির্ণয়ের যন্ত্র বা কম্পাস তৈরি করা যায় এবং কম্পাস কিভাবে কাজ করে তাও জানা গেল।

www.pathagar.com

আমরা জানি চুম্বকের আকর্ষণ শক্তি আছে। কিন্তু চুম্বক কোন ধরনের জিনিস আকর্ষণ করতে পারে?

উপকরণ : কাঠিভরা দিয়াশলাই, আলপিন, রাবারব্যান্ড, চুরের কাঁটা, পেরেক, কয়েন, বোতলের ছিপি সহ এ ধরনের ২০-২৫ টি জিনিস।

কার্যপ্রণালী : প্রথমে উপরের জিনিসগুলো একটা কাগজের উপরে ছড়িয়ে দিতে হবে। তারপর একটা চুম্বক দিয়ে এক এক করে সবগুলো জিনিসের উপর চুম্বক ধরতে হবে। চুম্বক যে জিনিসগুলো আকর্ষণ করছে অর্থাৎ চুম্বকের গায়ে লেগে যাচ্ছে সে জিনিসগুলো চুম্বকের গা থেকে ছাড়িয়ে একদিকে রাখতে হবে এবং যেগুলো আকর্ষণ করছে না সেগুলো অন্যদিকে। এখন দেখা যাচ্ছে যাবতীয় জিনিসগুলো দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গেছে।

এখন ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে, যে ধরনের জিনিস চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছে সেই ধরনের জিনিসগুলোর একটা বিশেষ ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য আছে। বৈশিষ্ট্যটা কি?

নির্দ্বিধায় বলা যায়, লোহা বা ইস্পাতের তৈরি জিনিসগুলোই চুম্বক আকর্ষণ করেছে। অতএব চুম্বক লোহা বা ইস্পাত দিয়ে নির্মিত জিনিসগুলো আকর্ষণ করে। এছাড়াও আরো কয়েকটি ধাতু আছে, চুম্বক যাদের আকর্ষণ করে। তবে তাদের ব্যবহার খুব কম।

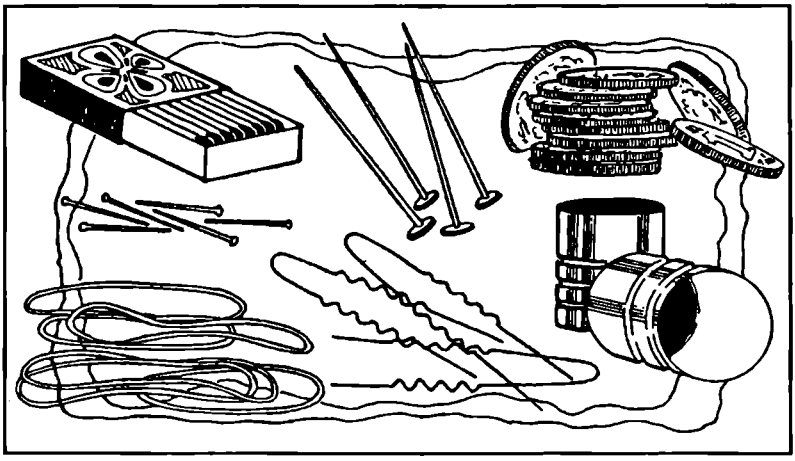

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, চুম্বক কোন ধরনের জিনিস আকর্ষণ করে এবং কোন ধরনের জিনিসকে আকর্ষণ করে না।

www.pathagar.com

প রী ক্ষা ৬৪

চুম্বকের শক্তি তার আকারের ওপর নির্ভর করে না—এ কথা কতখানি সত্যি?

উপকরণ : বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন মাপের অনেকগুলো চুম্বকখণ্ড, অনেকগুলো আলপিন।

কার্যপ্রণালী : প্রথমে টেবিলের ওপর আলপিনগুলো এক জায়গায় জড়ো করতে হবে। এবার এক এক চুম্বকখণ্ডগুলো সেই পিনের ওপর রেখে দেখ কতগুলো পিন চুম্বকখণ্ডটি আকর্ষণ করতে পেরেছে।

এভাবে এক-একটি চুম্বকখণ্ড কতগুলো আলপিন আকর্ষণ করেছে সেগুলো একটা কাগজে লিখে রাখতে হবে। এই পরীক্ষার মাধ্যমে কি দেখা গেছে বড় আকারের চুম্বক, ছোট আকারের চুম্বকের চেয়ে বেশি পিন আকৃষ্ট করেছে? না। আকারের ওপর চৌম্বক শক্তির কম বা বেশি নির্ভর করে না। চুম্বকের আয়ু এবং এর উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের ওপরই এর প্রকৃত শক্তি নির্ভর করে।

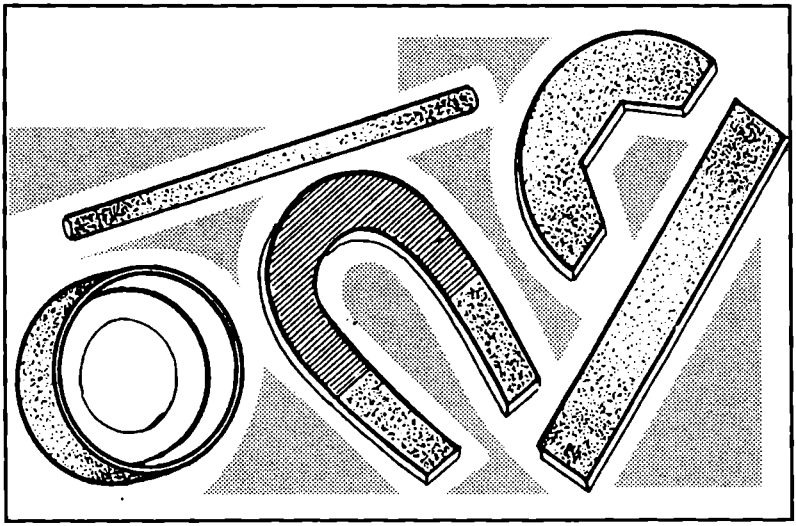

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, চুম্বকের শক্তি তার আকারের ওপর নির্ভর করে না।

www.pathagar.com

প রী ক্ষা ৬৫

বিদ্যুৎ চুম্বকের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎ তরঙ্গ নিয়ন্ত্রণের সহজ উপায়, যাতে ইচ্ছামতো তা প্রবাহিত বা বন্ধ করা যায়–কিভাবে?

উপকরণ : ৫ সেন্টিমিটার লম্বা ও ২ সেন্টিমিটার চওড়া এবং ২ সেন্টিমিটারের মতো মোটা এক খণ্ড কাঠ ও ২টি পেরেক।

কার্যপ্রণালী : প্রথমে কাঠের টুকরোতে ৩ সেন্টিমিটার ব্যবধানে ২টি পেরেক বসাতে হবে। এখন বিদুক্ষ চুম্বকের তারের একটা প্রান্তে যুক্ত করতে হবে একটা পেরেকের সঙ্গে এবং অন্য প্রান্তটি ব্যাটারির সেলের টার্মিনালে। কাঠের ওপর পেরেকটি যুক্ত করতে হবে ওই একই ধরনের তারের সাহায্যে সেলের অপর টার্মিনালের সঙ্গে। এখন পরীক্ষা করে দেখা যাক, বিদ্যুৎ চুম্বক কাজ করছে কিনা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বিদ্যুৎ চুম্বক কাজ করছে না। কেন? কারণ খুবই স্পষ্ট। যেহেতু, পেরেক দুটির মধ্যে কোনো সংযোগ বাহন নেই, সেহেতু পেরেক দুটির মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারছে না। সেজন্য এক টুকরো তার নিয়ে তার এক প্রান্ত ফাঁসের মতো করে একটা পেরেকের সঙ্গে আটকে দিতে হবে। তারের অপর দিকটা জড়িয়ে দিতে হবে অপর পেরেকটিতে। অথবা একটা ছোট্টা তামার পাতও তারের পরিবর্তে ব্যবহার করা যেতে পারে। আধুনিক ইলেকট্রিক সুইচের এটাই হলো প্রাথমিকরূপ। যদিও আজকাল নানা ধরনের নানা আকারের সুইচ বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, কিন্তু আসল ব্যাপারটা একই।

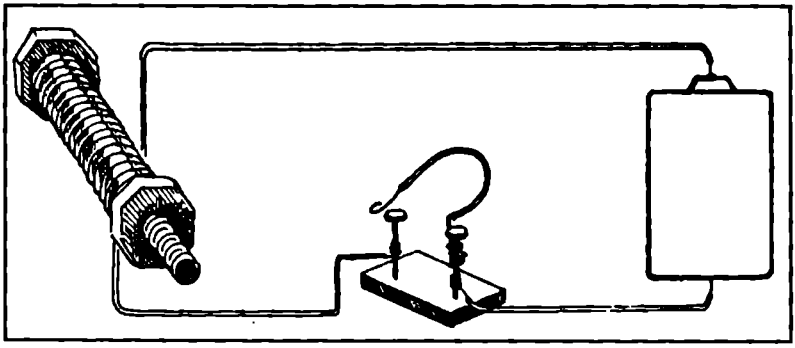

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, বিদ্যুৎ চুম্বকের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎ তরঙ্গ কিভাবে ইচ্ছেমতো প্রবাহিত বা বন্ধ করা যায়।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ৬৬

অন্যান্য চুম্বকের মতো বিদ্যুৎ চুম্বকেরও কি উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু আছে?

উপকরণ : একটা বিদ্যুৎ চুম্বক, ইলেকট্রিক তার, ব্যাটারি, আলপিন এবং একটা সাধারণ চুম্বক।

কার্যপ্রণালী : প্রথমে বিদ্যুৎ চুম্বকটি একটা টেবিলের ওপর রেখে এর দুটি তারই একটি ব্যাটারীর সঙ্গে যুক্ত কর এবং এর চুম্বশক্তি যাচাই করার জন্য চুম্বকের কাছে আলপিন ধরতে হবে। এখন সাধারণ চুম্বক এনে তার একটা প্রান্ত ধীরে ধীরে বিদ্যুৎ চুম্বকের এক প্রান্তে নিয়ে আসতে হবে। দেখা যাক কি হয়। এরপর চুম্বকের অন্য প্রান্তটি বিদ্যুৎ চুম্বকের সেই একই প্রান্তে আগের মতোই নিয়ে আসতে হবে। পার্থক্য লক্ষ্য করতে হবে।

এবার একই পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করতে হবে বিদ্যুৎ চুম্বকের অন্যপ্রান্তে ম্যাগনেটের উভয় প্রান্ত পর পর এনে। ফল কিন্তু আগের মতোই হবে। অর্থাৎ ইলেকট্রো-ম্যাগনেট বা বিদ্যুৎ চুম্বক, ম্যাগনেট বারের বা চুম্বক খণ্ডের একটা মেরু আকর্ষণ করছে, অন্য মেরুকে করছে বিকর্ষণ, যার অর্থ বিদ্যু-চুম্বকেরও মেরুবিন্দু দুটি।

তবে দুই মেরুর পারস্পরিক অবস্থান্তর কি সম্ভব? এটা জানতে হলে, ইলেকট্রো-ম্যাগনেটের দুটি তারের অবস্থার পরিবর্তন করে ব্যাটারীর বিপরীত টার্মিনালের সঙ্গে যুক্ত করে এই পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। পরীক্ষার ফলাফল প্রমাণিত করবে যে, মেরূপ্রান্তের স্থিতিতে পরিবর্তন হয়েছে।

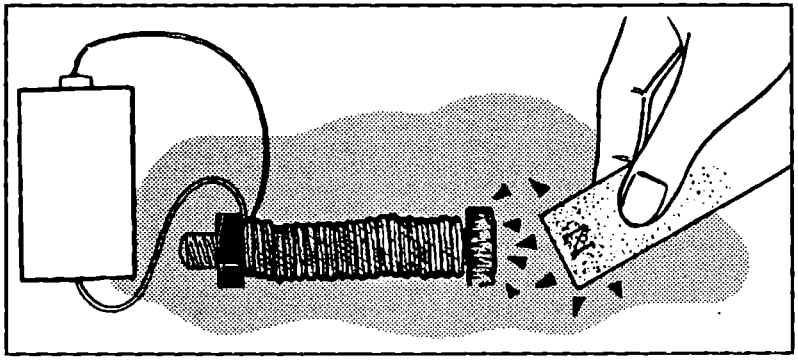

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, সাধারণ চুম্বকের মতো বিদ্যুৎ-চুম্বকের ও উত্তর ও দক্ষিণ মেরু আছে।

www.pathagar.com

প রী ক্ষা ৬৭

অসদৃশ বা 'বিপরীত ধর্মী ইলেকট্রিক চার্জ' পরস্পরকে আকর্ষণ করে–প্রমাণ কর?

উপকরণ : একটা কাচের রড, কিছুটা সিল্কের সুতো, এক টুকরো সিল্কের কাপড় এবং একটা রাবারের চিরুনি।

কার্যপ্রণালী : প্রথমে সিল্কের সুতো দিয়ে কাচের রডের ঠিক মাঝখানে বাঁধতে হবে। এবার সমান্তরালভাবে ঝুলিয়ে দিতে হবে। এখন সিল্কের কাপড় দিয়ে কাচের রডটা বেশ ভালো করো ঘষতে হবে।

একইভাবে রাবারের চিরুনি নিয়ে, পশমের কাপড়ে বেশ ভালোভাবে ঘষতে হবে। এবার চিরুনিটা নিয়ে যেতে হবে কাচের রডের এক প্রান্তে। খেয়াল করতে হবে যেন চিরুনি ও কাচের রড পরস্পরকে স্পর্শ না করে। এখন দেখা যাক কি ঘটে?

নেগেটিভ বা ঋণাত্মকভাবে চার্জ করা চিরুনি পজেটিভ বা ধণাত্মকভাবে চার্জ করা কাচের রডকে আকর্ষণ করছে, অর্থাৎ প্রমাণ করছে, মৌলিক সূত্রের সত্যতা।

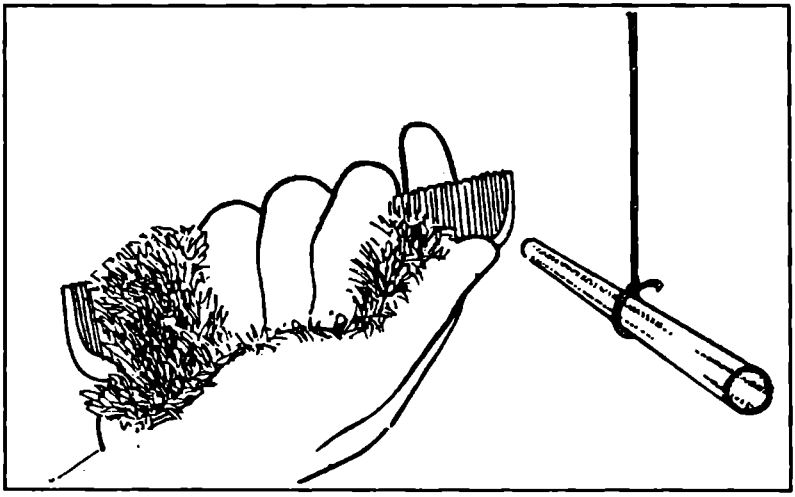

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, অসদৃশ বা 'বিপরীত ধর্মী ইলেকট্রিক চার্জ' পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ৬৮

যে কোনো স্থানে এবং যে কোনো সময় এবং খুব সহজে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়—কিভাবে?

উপকরণ : একটা বেলুন, এক টুকরো কাপড়, ঘুড়ি তৈরির কাগজ।

কার্যপ্রণালী : বিদ্যুতের কথা ভাবলেই চলে আসে বিদ্যুৎ প্রবাহের কথা। এছাড়াও আরেক ধরনের বিদ্যুৎও আছে, যাকে বলে স্থির বা ঘর্ষণজনিত বিদ্যুৎ। ফোলানো একটা বেলুনকে কাপড়ে ভালো করে ঘসে ছেড়ে দিলে দেখা যাবে দেয়ালের দিকে গেছে এবং দেয়ালে আটকে আছে। তাই না? এখন ঘুড়ি তৈরি করার কাগজটি দেয়ালের গায়ে মেলে ধরে হাতের তালু দিয়ে বেশ ভালো করে কাগজটা

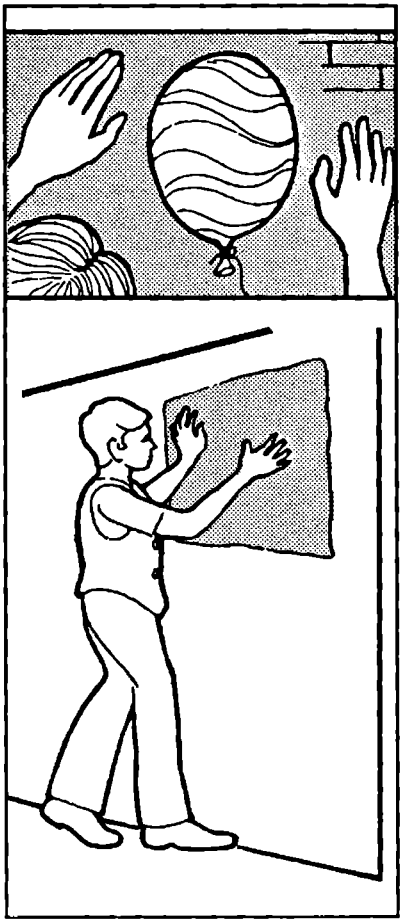

ঘষার পর দেয়ালের গায়ে আটকে দিতে হবে। কাগজের শিটটা কি দেয়ালের গা থেকে পড়ে যাবে? না, ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে পড়বে না। কিছুক্ষণ পরে পড়বে। এতক্ষণ আটকে থাকার কারণ কি? কারণ হলো, বেলুন এবং কাগজের ওপর হাতের তালুর ঘর্ষণে তৈরি হয়েছে নিশ্চল বিদ্যুৎ এবং এই বিদ্যুৎ দেয়ালের গায়ে আটকে থাকতে সাহায্য করেছে।

শুধু কি তাই, অন্ধকার শীতের রাতে ঝট্ করে যদি গায়ের উলের সোয়েটারটা খুলে ফেলা হয়, তাহলে সোয়েটারে স্ফুলিঙ্গ দেখা যাবে এবং চটপট শব্দ হবে। কাজেই যখন স্বচক্ষে এবং নিজ কানে বিদ্যুৎ দেখা যাচ্ছে এবং শোনা যাচ্ছে তখন বিদ্যুত যে যেখানে সেখানে উৎপন্ন করা যায় তাতে কোনো সন্দেহ থাকছে না।

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, যে কোনো স্থানে এবং যে কোনো জায়গায় খুব সহজে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়।

www.pathagar.com

সিল্কের সুতোয় মুড়ি ঝুলিয়ে এক ধরনের খেলা খেলা যায় আর সে খেলার পিছনে কাজ করে বিদ্যুৎ–কিভাবে?

উপকরণ : সিল্কের সুতো, আঠা, কয়েকটা মুড়ি, একটা চিরুনি।

কার্যপ্রণালী : প্রথমের সিল্কের সুতোর একদিকে আঠা দিয়ে একটা মুড়ি আটকে, সুতোসহ মুড়িটা এমনভাবে ঝুলিয়ে দিতে হবে যেন তা ২০ সেন্টিমিটার নিচে ঝুলে থাকে এবং তা যেন এদিক-ওদিক সরে যেতে পারে। একইভাবে আর একটা মুড়ি ঝোলাতে হবে প্রথমটার পাশে।

এবার রাবারের চিরুনি নিয়ে উলের বা পশমি কাপড়ে ভালো করে ঘষে, ঝোলানো মুড়ি কাছে ধরলে দেখা যাবে মুড়ি দুটো দ্রুত চিরুনির দিকে সরে আসতে চাইছে, আবার একটু পরে দেখা যাবে পেছনের দিকে সরে যাবে এবং শেষে মুড়ি দুটি পরস্পরের কাঝ থেকে দূরে চলে যাবে। এর কারণ হলো, চার্জ করা চিরুনি প্রথমে মুড়ি দুটিকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেছে। যখন তা কাছে আসবে তখন সেও চার্জড হয়ে যাবে, ঠিক যেভাবে চিরুনি চার্জন হয়েছিল। কাজেই তা সরে যাবে। যেহেতু মুড়ি দুটির চার্জ অভিন্ন, সেহেতু তারা পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে, অর্থাৎ পরস্পর থেকে দূরে সরে যাবে।

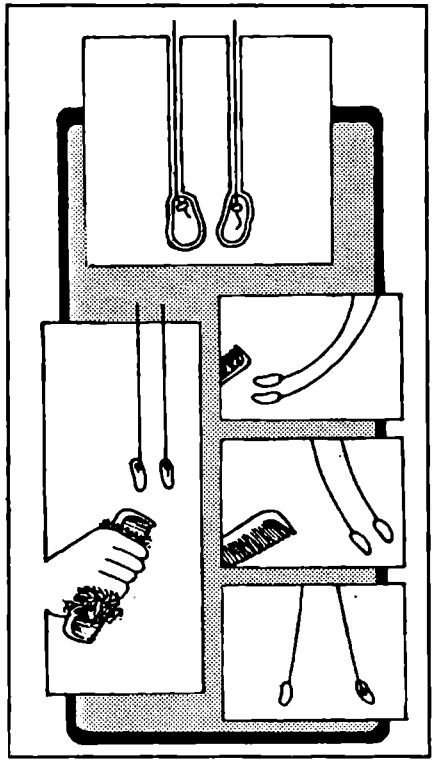

অর্থাৎ সূত্র হলো, সদৃশ্য চার্জ বিকর্ষণ করে এবং অসদৃশ্য বা বিপরীত চার্জ আকর্ষণ করে। দুই পজেটিভ বা দুই নেগেটিভ পরস্পরকে আকর্ষণ করে না। কিন্তু পজিটিভ নেগেটিভকে এবং নেগেটিভ পজিটিভকে আকর্ষণ করে।

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, ঘরে বসে মুড়ি ও সিল্কের সুতোর মাধ্যমে মজার খেলা খেলা যায় আর সে খেলার পেছনে কাজ করে বিদ্যুৎ।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ৭০ স্থির বা নিশ্চল বিদ্যুৎ কি ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য নিরাপদ উপায়ে ধরে রাখা কিংবা সঞ্চারণ করা সম্ভব?

উপকরণ : একটা হ্যাঙ্গার, ১৫ সেন্টিমিটার পুরু বর্গাকৃতি এক টুকরো কাঠ, একটা কাজের গ্লাস, পেপার ক্লিপ, এ্যালুমিনিয়ামের ফয়েল বা রাংতা।

কার্যপ্রণালী : স্থির বিদ্যুৎ ধরে রাখার জন্য এতটা মডেল তৈরি করতে হবে, যার নাম লিডেন জার। প্রথমে হ্যাঙ্গারের সাহায্যে একটা হুক তৈরি করতে হবে (ছবিতে যেভাবে আছে)। এখন কাঠের টুকরোটার মাঝখানে ছিদ্র করে তার ভেতর হুকটা লাগাতে হবে এবং গ্লাসের মুখে ঢাকনা দিতে হবে। এরপর পেপার ক্লিপ দিয়ে একটা চেন তৈরি করে তা ঝুলিয়ে দিতে হবে হুকের সঙ্গে।

এবার অ্যালুমিনিয়ামের ফয়েল বা রাংতাটা আঠা দিয়ে গ্লাসের নিম্নাংশে লাগিয়ে বাইরে ও ভেতরে লাগিয়ে দিতে হবে। এরপর কাঠের টুকরোর সঙ্গে আটকানো হুকটি পেপার ক্লিপের চেনসহ গ্লাসের ভেতর এমনভাবে নামিয়ে দিতে হবে যাতে তা ভেতরে ঝুলে থাকে। এবার আরো খানিকটা রাংতা নিয়ে গোল করে হুকের যে দিকটা বাইরে আছে, তার মুখে লাগিয়ে দিতে হবে। এবার, লম্বা ইনস্যুলেটেড তার নিয়ে উভয় দিকের ইনস্যুলেশন ছিঁড়ে ফেলতে হবে। তারের একটা মুখ গ্লাসের বাইরের দিকের রাংতার সঙ্গে টেপ দিয়ে আটকে দিতে হবে এবং অপর মুখটা বাড়ির কলের সঙ্গে। এখন তৈরি হয়ে গেল লিডেন জার।

জারকে চার্জ করার জন্য, রাবারের চিরুনি উলের কাপড়ে ঘষে, হুকের ওপরে লাগানো রাংতার গোলাকে বারংবার স্পর্শ করাতে হবে। এখন স্বচক্ষে যদি বিদ্যুৎ সঞ্চার দেখতে ইচ্ছে হয় তাহলে প্রায় ২০ সেন্টিমিটার লম্বা হ্যাঙ্গারের তার নিয়ে তাকে অর্ধ গোলাকার করতে হবে। এবং এই অর্ধ গোলাকারের মধ্যাংশে কয়েক ভাঁজে টেপ জড়িয়ে দাও। টেপ জড়ানো অংশটি ধরে, তার একটা দিক, গ্লাসের বাইরের দিকের রাংতাতে স্পর্শ করাতে হবে এবং অপর দিকটা স্পর্শ করাতে হবে বলের বো গোলকের ওপরে। গোলক স্পর্শ করার আগেই দেখা যাবে গোলক থেকে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ তারের মুখে ধাবিত হচ্ছে, যার দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে স্থির বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হচ্ছে।

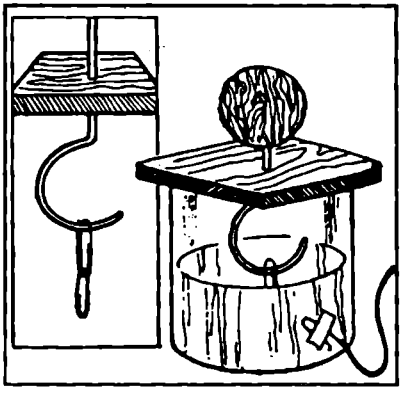

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, স্থির বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হয়।

www.pathagar.com

প রী ক্ষা ৭১

সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামার সময় ওপরে বা নিচে বসানো সুইচের যে-কোনো একটি টিপে বাতি জ্বালানো যায়। কিন্তু কিভাবে এই বাতি জ্বলে?

উপকরণ : ১.৫ ভোল্টের একটা ব্যাটারি সেল, ৩ ভোল্টের একটা বাল্‌ব, কয়েক টুকরো তামার তার বা ফিউজ তার এবং দু'মুখো বা টু-ওয়ে সুইচ, প্লাই-উড বা কাঠের পাটাতন, টিনের দুটি পাত।।

কার্যপ্রণালী : রাতে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় সুইচ টিপলে, আলো জ্বলে। আবার ওপরে উঠে সেখানকার সুইচ টিপলে আলো নিভে যায়। এভাবে একেক জন আলো জ্বালান এবং উপরের সুইচ টিপে আলো নেভান। এর অর্থ জ্বালানো ও নেভানোর জন্য সিঁড়িতে বসানো দুটি সুইচের মধ্যে যে কোনো একটি টিপলেই হবে। কিন্তু কিভাবে তা হচ্ছে? ঘরে যেভাবে বাতি লাগানো হয়েছে সিঁড়িতে লাগানো বাতি তা একটু ভিন্ন।

এই পরীক্ষার জন্য প্রথমে ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে, সেভাবে সুইচ ও বাল্‌ব যুক্ত করে প্লাইউড বা কাঠের পাটাতনের ওপর বসাতে হবে। সার্কিটের সঙ্গে বাল্‌ব যুক্ত করতে সামান্য অসুবিধা হতে পারে। এজন্য ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে, সেই আকারের টিপের তা কেটে নিতে হবে। এবার সুইচ দুটির জায়গা অনুযায়ী (যেভাবে ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে) ব্যাটারির সঙ্গে সার্কিট যুক্ত করতে হবে। আর সঙ্গে সঙ্গেই বাল্‌ব জ্বলে উঠবে। তবে যদি কোনো একটা সুইচ 'অন' বা 'অফ' করা হয় তাহলে বাল্‌ব জ্বলবে বা নিভবে। এখন নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে, সিঁড়ির ওপরে না নিচে বসানো টু-ওয়ে সুইচ সিস্টেম কিভাবে কাজ করে।

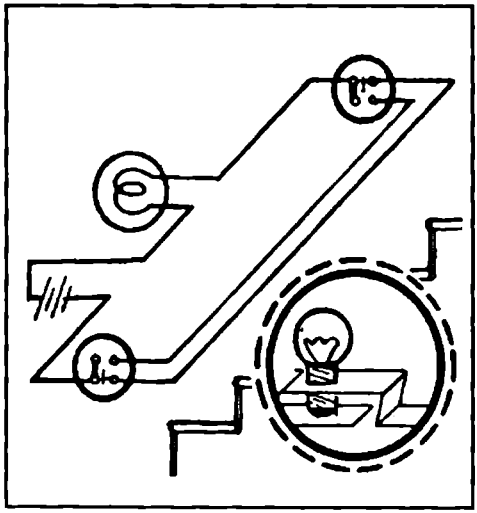

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, সিঁড়িতে আলো জ্বালানো এবং নেভানোর জন্য একটা সুইচ কিভাবে কাজ করে।

www.pathagar.com

প রী ক্ষা ৭২

বৈদ্যুতিক বাল্‌বে প্রায় ফিউজ কেটে যায়। এই ফিউজ বস্তুটা কি? এর সুবিধাই বা কি?

উপকরণ : একটা বৈদ্যুতিক চুম্বক, একটা বৈদ্যুতিক সুইচ, একটা কাঠের পাটাতন, দুটি পেরেক, একটা ব্যাটারি, একটা ছোটো কর্কের টুকরো, পাতলা তার।

কার্যপ্রণালী : একটা সার্কিট সম্পূর্ণ করার জন্য তারের সাহায্যে বৈদ্যুতিক-চুম্বক বা ইলেকট্রো-ম্যাগনেটকে কাঠের পাটাতনের উপর যুক্ত করতে হবে একটা সুইচ। পাটাতনে পেরেক দুটি পোতা থাকবে একটা ব্যাটারি সেলের সঙ্গে। এখন সুইচ ও সেলকে যুক্তকারী তারটা কেটে দিতে হবে। এবার কর্কের ছোট টুকরো নিয়ে তাতে বসাতে হবে দুটি পেরেক। পাতলা তার দিয়ে পেরেক দুটিকে বেঁধে দিয়ে কাটা তারের দুটি মুখ কর্কের দুটি পেরেকের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

সার্কিট সম্পন্ন করতে এর সঙ্গে সুইচকে যুক্ত করে বৈদ্যুতিক চুম্বক কাজ করছে কিনা দেখতে হবে। এবার সার্কিটে আগের ব্যাটারির সঙ্গে আরো একটি ব্যাটারি লাগাতে হবে এবং প্রয়োজন হলে আরো একটি, অর্থাৎ মোট তিনটি।

এ অবস্থায় কর্কের পেরেক দুটিকে যুক্ত করা পাতলা তারে নিশ্চয় কিছু ঘটবে। সোজা কথায় ফিউজ কেটে যাবে এবং সব মিলিয়ে বৈদ্যুতিক চুম্বকও কাজ করবে না।

এখন নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে ফিউজের সার্থকতা কি? কোনো কারণে বিদ্যুৎ প্রবাহ যদি অত্যধিক হয়ে যায়, তাহলে পাতলা তার গলে যায় (অতিরিক্ত বিদ্যুৎ প্রবাহ জনিত উত্তাপের ফলে) এবং সার্কিট ছিন্ন হয়ে যায়। ফিউজ তার যদি না থাকতো, তাহলে সমগ্র সার্কিটটাই অত্যন্ত গরম হয়ে পড়তো, ফলে বাড়িতে আগুনও লেগে যেতে পারতো।

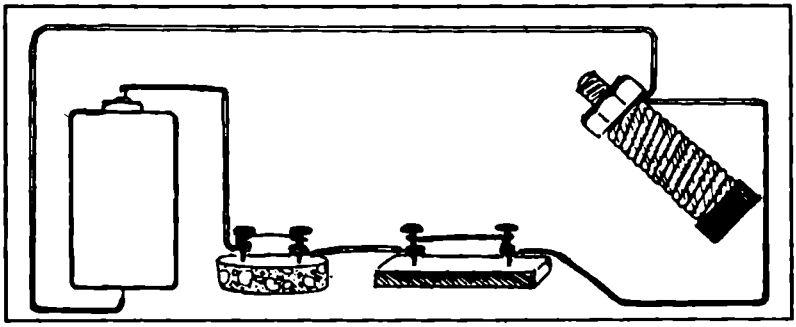

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, ফিউজ কি, ফিউজ কেন কেটে যায় এবং ফিউজের উপকারিতা কি?

www.pathagar.com

আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে টেলিগ্রামের মাধ্যমে দ্রুত ভালো বা খারাপ খবর জানানো যায়। কিন্তু এই টেলিগ্রাম কিভাবে কাজ করে?

উপকরণ : তিনটি বিভিন্ন আকারের কাঠের খণ্ড, কয়েকটা পেরেক, ইনস্যুলেটের তার, দুটো ব্যাটারি সেল।

কার্যপ্রণালী : প্রথমে ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে, সেভাবে ছোট কাঠের খণ্ডটা বড়টার ওপরে বসাতে হবে। বড় কাঠের খণ্ডে দুটো পেরেক পুঁতে ইনস্যুলেটের তার দিয়ে তা মুড়ি দিতে হবে। একটি পেরেক মুড়তে হবে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে, নিচ থেকে উপর পর্যন্ত। প্রতিটি পেরেকে অন্তত ২০ বার তার দিয়ে পেঁচানো থাকবে। তারের দুটো মুখ ব্যাটারি সেলের সঙ্গে যুক্ত করলে পেরেক দুটি বৈদ্যুতিক চুম্বক বা ইলেকট্রো ম্যাগনেটের কাজ করবে। এবার তৃতীয় কাঠের খণ্ডটিতে একটি পেরেক পুঁতে ইনস্যুলেটেড তারের একটা মুখ পেরেকের সঙ্গে আটকে দিতে হবে। তবে তারের মুখ থেকে ইনস্যুলেশন সরিয়ে দিতে যেন ভুল না হয়। কাঠে আরেকটি পেরেক পোঁতার আগে, ট্যালকম পাউডারের টিনের কৌটা কেটে তা থেকে "T" ও "I" আকারের দুটি অংশ তৈরি করতে হবে। "I" খণ্ডটি সামান্য বাঁকিয়ে ছোটো কাঠের এবং "T" খণ্ডটি বড় কাঠের ওপর পেরেক দিয়ে আটকে দিয়ে ব্যাটারির সঙ্গে তার যুক্ত করে সার্কিট তৈরি সম্পন্ন করতে হবে।

"I" খণ্ডটিতে চাপ দিলেই তা নিচের পেরেকটি স্পর্শ করবে এবং স্পর্শ করলেই "T" খণ্ডটি নিচের পেরেক দুটি তাড়িত চুম্বকে পরিণত হবে এবং ঐ টিনের পাতটিকে নিজেদের দিকে আকর্ষণ করতে থাকবে এবং পাতটি তখন 'টক্কা' শব্দ করে পেরেকের ওপর আঘাত করবে। আবার যে মুহূর্তে "I" পাতটি ছেড়ে দেয়া হবে, সে মুহূর্তে "T" পাতটি পুনরায় নিজস্থানে ফিরে আসবে।

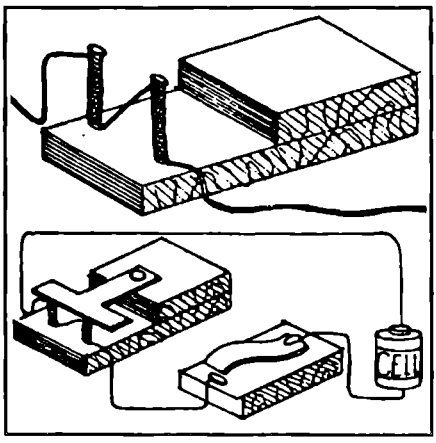

স্যামুয়েল এফ. বি. মোর্স টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করেন এবং 'টক্কা' 'টক্কা' শব্দকে একটা সাংকেতিক ভাষায় রূপান্তরিত করেন। সে জন্য আজ পর্যন্ত এই ভাষাকে বলা হয় মোর্স কোড।

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, টেলিগ্রাম কি এবং তা কিভাবে কাজ করে?

www.pathagar.com

প রী ক্ষা ৭৪ তারের কয়েলে ঘুরন্ত একটি চুম্বক, কয়েলে বিদ্যুৎ প্রবাহের সঞ্চার করতে পারে–কিভাবে?

উপকরণ : নরম লোহার একটি বার, (১৫ সেন্টিমিটার X ১ সেন্টিমিটার X ৩ সেন্টিমিটার), ইনস্যুলেটেড তামার তার, ১.৫ ভোল্টের একটি বৈদ্যুতিক বালব। এছাড়াও প্রয়োজন ৪ সেন্টিমিটার X ১ সেন্টিমিটার X ৫ সেন্টিমিটার সাইজের একটি ম্যাগনেট বার এবং দুটি কাটিম সুতোর রিল আর একটি সুঁচ।

কার্যপ্রণালী : তারের কয়েলে একটি চুম্বক যদি খুব জোরে ঘোরানো যায়, তাহলে কয়েলে বিদ্যুৎ প্রবাহ সঞ্চারিত হবে। আর বৈদ্যুতিক শক্তি নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের ওপর : কয়েলের কুণ্ডলীর সংখ্যা ঘুরন্ত চুম্বকের শক্তি এবং তার গতির ওপর। পরবর্তীকালে ১৮৩১ সালে মাইকেল ফ্যারাডের উদ্ভাবনের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেনারেটর তৈরি হয়, যার দ্বারা ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্টন করা হয়, মেশিন চালানো, আলো জ্বালানো এবং তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে। এখন বাড়িতে বসে একটা ডায়নামোর মডেল বানিয়ে নিলে সমগ্র ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

প্রথমে নরম লোহার বারটি ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে বাঁকিয়ে নিতে হবে। লোহার এই লম্বা টুকরোটিতে সেভাবে একের পর এক এভাবে পাঁচবার ইনস্যুলেটেড তামার তার দিয়ে পাক দিয়ে উভয় প্রান্তে যুক্ত করতে হবে ১.৫ ভোল্টের একটি বালবের সঙ্গে।

এখন ম্যাগনেট বারটিকে কাটিম সুতোর রিলে খাঁজ কেটে আটকতে দিতে হবে। এবার সেলাই করা সুঁচটি নিয়ে এই কাটিমকে অন্য আরেকটি কাটিমের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। শক্ত করে ধরে রাখার জন্য লোহার স্ট্যান্ডের ভেতর ছিদ্র করে তার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাও। কাটিম দুটিকে সুঁচের দুদিকে এমনভাবে লাগাতে হবে যাতে ম্যাগনেটের সঙ্গে যুক্ত কাটিমটি যেন তারের কয়েলের দিকে থাকে। এবার দ্বিতীয় কাটিমটিকে সুতো দিয়ে সাইকেলের চাকা বা অনুরূপ কোনো বস্তু, যা দ্রুত ঘোরে, তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। সমগ্র উপকরণগুলো যেমন, কয়েল বার, বাল্‌ব এবং ভিত্ শক্ত করে ধরে রাখার জন্য ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে, সেভাবে কাঠের পাটাতনের সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে আটকে দিতে হবে।

এখন চাকাটা যখন ঘুরবে, তখন প্রথম ও দ্বিতীয় রিলটিও ঘুরতে থাকবে সুতোর চাপের দরুণ। ম্যাগনেট বারও, নরম লোহার পাতের মধ্যে ঘুরবে এবং বিদ্যুৎ তরঙ্গ,

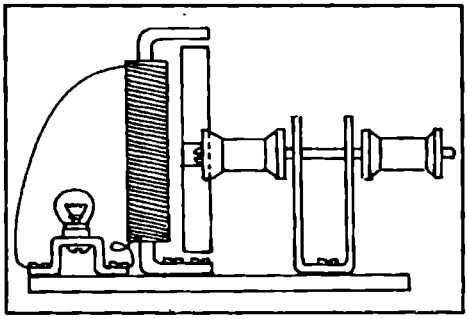

কয়েলে প্রবাহিত হতে থাকবে, যার ফলে বাল্‌ব জ্বলবে এবং চাকার গতির সঙ্গে সঙ্গে বালবের উজ্জ্বলতা বাড়বে বা কমবে।

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, তারের কয়েলে ঘুরন্ত একটি চুম্বক, কয়েলে কিভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহের সঞ্চার করতে পারে।

www.pathagar.com

শব্দ কি এবং কিভাবে শব্দের উৎপত্তি হয়?

উপকরণ : একটা স্টিলের স্কেল, ঢাকনা ছাড়া একটা খালি বাক্স, একটা রাবার ব্যান্ড, রান্নাঘরে ব্যবহৃত রুটি তৈরির চিমটা।

কার্যপ্রণালী : শব্দ কি বুঝতে হলে কয়েকটা ছোটোখাটো পরীক্ষা করতে হবে। প্রথমে টেবিলের ওপর স্কেলটা এমনভাবে রাখতে হবে, যার বেশির ভাগটা থাকে টেবিলের বাইরে। টেবিলের দিকের অংশটা চেপে রেখে শোনার চেষ্টা করতে হবে কোনো শব্দ হচ্ছে কিনা।

এবার টেবিলের অংশটা আগের মতো চেপে রেখেই স্কেলের বেরিয়ে থাকা অংশটা নুইয়ে ছেড়ে দিয়ে শোনার চেষ্টা করতে হবে কোনো শব্দ হচ্ছে কিনা।

পরবর্তী পরীক্ষা হচ্ছে একটা ঢাকনা ছাড়া খালি বাক্স নিয়ে তাতে একটা রাবার ব্যান্ড জড়িয়ে দিয়ে দেখতে হবে কোনো শব্দ হচ্ছে কিনা। না, কোনো শব্দ হচ্ছে না। এখন রাবার ব্যান্ডটা টেনে ছেড়ে দিলে বোঝা যাবে শব্দ হচ্ছে।

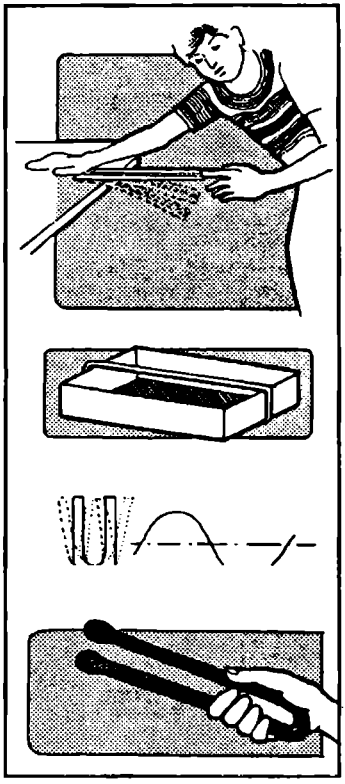

রান্নাঘরে রুটি তৈরি করার সময় চিমটা ব্যবহার করা হয়। চিমটার জোড়ার দিকটা শক্ত করে ধরে দেখা যাবে কোনো আওয়াজ হচ্ছে না। কিন্তু চিমটাটা মাটিতে সামান্য আঘাত করলে দেখা যাবে চিমটাটা কাঁপছে। এভাবে আবার আঘাত করলে শোনা যাবে তার আওয়াজ।

এই পরীক্ষাগুলো থেকে স্পষ্ট যাচ্ছে যে, কোনো বস্তু ডানে-বামে সামনে নড়তে থাকে বা কাঁপতে থাকে তখন শব্দের উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ, কম্পন বা তরঙ্গ থেকে আওয়াজের উৎপত্তি হয়। কারণ কোনো জিনিসের ডানে-বামে নড়তে থাকাকেই বিজ্ঞানের ভাষায় কম্পন বা তরঙ্গ (Vibration) বলে।

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, কোনো বস্তুর কম্পন বা তরঙ্গের ফলে শব্দের উৎপত্তি হয়।

www.pathagar.com

প রী ক্ষা ৭৬

শব্দ কান পর্যন্ত পৌছাবার জন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় কি?

উপকরণ : একটি ফ্লাস্ক বা বোতল, পানি, একটা পেনসিল, ছোট্ট একটি ঘণ্টা।

কার্যপ্রণালী : ফ্লাস্ক বা বোতলে সামান্য পানি নিয়ে গরম করতে হবে। বোতলের ছিপির মাঝখানে একটা ছিদ্র করে তার মধ্য দিয়ে পেন্সিলটা প্রবেশ করাতে হবে। পেন্সিলের মুখে এমনভাবে ঘণ্টাটা বেঁধে দিতে হবে যেন পেন্সিলটা নড়াচড়া করলে ঘণ্টাটা বাজে। বোতল ঠাণ্ডা হলে পেন্সিলটা নাড়লে দেখা যাবে ঘণ্টা নড়ছে কিন্তু শব্দ শোনা যাচ্ছে না। এবার বোলের ছিপিটা একবার খুলে আবার আটকে দিলে দেখা যাবে বোতল বা পেন্সিল নাড়ালে ঘণ্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কেন এমন হচ্ছে?

গরম করায় বোতলের পানি বাষ্পে পরিণত হয়ে ভেতরের হাওয়া বের করে দিচ্ছে। বোতলের মুখ কর্ক দিয়ে এয়ারটাইট করার পর ঠাণ্ডা হতে দিলে সব বাষ্প আবার পানিতে পরিণত হবে। এভাবে বোতলের ভেতর আংশিক বায়ুশূন্য অবস্থার সৃষ্টি হয়, কারণ বাইরের বাতাস ভেতরে ঢুকতে পারছে না। কিন্তু যে মুহূর্তে বোতলের মুখের ছিপি খুলে নেয়া হলো সে মুহূর্তে বাইরের বাতাস দ্রুত বোতলে প্রবেশ করে বায়ুশূন্য অবস্থা দূর করেছে। আর তখনই বোতলের ভেতরের ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল, যা আগের অবস্থায় শোনা যায় নি। অর্থাৎ শব্দ বা ধ্বনি তরঙ্গের একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাবার জন্য একটা বাহন দরকার হয়। শব্দ তরঙ্গ বায়ু শূন্যতা বা ভ্যাকুয়ামের মধ্য দিয়ে যেতে পারে না।

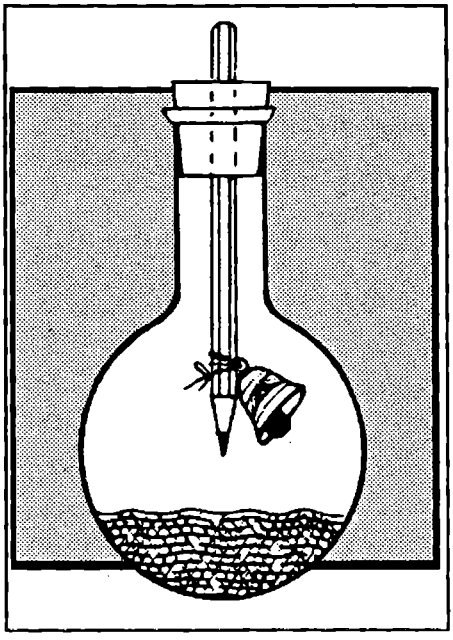

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, উৎপত্তি স্থল থেকে কান পর্যন্ত পৌছানোর জন্য একটা মাধ্যমের প্রয়োজন হয় আর সে মাধ্যম হচ্ছে বাতাস।

www.pathagar.com

মানুষের হৃৎপিণ্ড দিন-রাত্রি চলে। কিন্তু নিজে তার চলা শোনা যায় না। হৃৎপিণ্ডের শব্দ নিজেও শোনা যাবে কিভাবে?

উপকরণ : 'T' ও 'Y' আকারের ওয়াটার জয়েন্টস (পাওয়া যাবে স্যানিটারির দোকানে), তিনটি রাবার বা প্লাস্টিক টিউব (৫০ সেন্টিমিটার লম্বা)।

কার্যপ্রণালী : এই পরীক্ষার জন্য যে যন্ত্রটি তৈরি করতে হবে সেটার আকার ও কাজ হবে ডাক্তারদের স্টেথোস্কোপের মতো। পানির প্রবাহ পৃথক করার জন্য 'T' ও 'Y' আকারের ওয়াটার জয়েন্টস ব্যবহার নিতে হবে প্রথমে। এরপর তিনটি রাবার বা প্লাস্টিক টিউব 'Y' আকারের খণ্ডে লাগাতে হবে। হৃৎস্পন্দন শোনার জন্য এখন দরকার তিনটি ধাতু নির্মিত কুপি, যেগুলি লাগাতে হবে রাবার পাইপের অন্যদিকের মুখে (ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে)।

এবার কাউকে দুটি কুপি কানে লাগাতে বলতে হবে এবং তৃতীয় কুপিটিকে নিজের বুকে অর্থাৎ হৃৎযন্ত্রের ঠিক ওপরে চেপে ধরতে হবে। এরপর হৃৎযন্ত্রের স্পন্দন মিনিটে কতবার হয় তা গুণতে হবে।

এবার কিছুটা দৌড়াদৌড়ি করে এসে আগের মতোই হৃৎস্পন্দন গুণতে হবে। দেখা যাবে হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেছে। বিশ্রাম নেবার পর আবার হৃৎস্পন্দন গুনতে হবে। এবারের রিট প্রথমবারের মতো হবে। কিন্তু দৌড়াদৌড়ি করার পর হৃৎস্পন্দন কেন বেড়ে গেল?

আসলে, শারীরিক পরিশ্রমে দৈহিক শক্তি উৎপাদনের জন্য দেহের দরকার হয় অতিরিক্ত অক্সিজেনের। রক্ত এই অক্সিজেন ফুসফুসের মধ্য দিয়ে, সারাদেহে সরবরাহ করে। দৌড়াদৌড়ি করলে দেহে বেশি অক্সিজেনের দরকার পড়ে এবং তার অভাবে আমরা হাঁপাতে থাকি। যেহেতু হৃৎযন্ত্র হলো দেহে রক্ত সরবরাহের একটি পাম্প, কাজেই রক্তের মাধ্যমে অতিরিক্ত অক্সিজেন জোগাতে তাকে দ্রুত কাজ করতে হয়, তাই তার স্পন্দনের গতিও যায় বেড়ে।

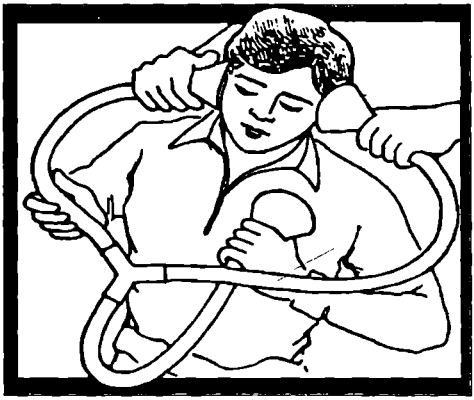

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, হৃৎস্পন্দন যে দিন-রাত্রি চলতে থাকে তা ঘরে বসে নিজেও শোনা যায়।

www.pathagar.com

প রী ক্ষা ৭৮ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কিভাবে প্রমাণ করা যায় যে, গাছের কাণ্ড সবসময়ই উপরের দিকে এবং মূল নিচের দিকে বড় হতে থাকে?

উপকরণ : এক টুকরো ব্লটিং পেপার, মুখওয়ালা একটা বোতল, কিছু ধানের বীজ।

কার্যপ্রণালী : প্রথমে ব্লটিং পেপার গোল করে মুড়ে বড় মুখওয়ালা বোতলের মধ্যে রাখতে হবে। এরপর ব্লটিং পেপার ও বোতলের গাত্রদেশের মাঝে ধানের বীজগুলো রাখতে হবে। বীজগুলো অবশ্যই দু-তিন ঘণ্টা ধরে যেন পানিতে ভেজানো হতে হবে। বোতলে সামান্য পানি দিয়ে রাখতে হবে, যাতে ব্লটিং পেপার শুকিয়ে না যায়। এবার বোতলটি এমন স্থানে রাখতে হবে যেখানে আলো ও উত্তাপ পাওয়া যায়।

কয়েকদিনের মধ্যেই বীজের অঙ্কুরোদগম হবে, অর্থাৎ মূল দেখা যাবে এবং কয়েক দিনের মধ্যেই মূল নিম্নাভিমুখী হতে শুরু করবে। প্রকৃতির এ এক বিস্ময়। মূল সর্বদাই নিচের দিকে যাবে মাটির সন্ধানে এবং মাটির মধ্য থেকে বেঁচে থাকার খাদ্যরস শোষণ করবে। যে বিশেষ শক্তিতে এটা হচ্ছে তাকে বলে পজিটিভ জিওট্রপিজম। এই শক্তির বশবর্তী হয়ে মূল পানির সন্ধানে মাটির গভীরে প্রবেশ করে, আলো থেকে দূরে।

বোতল থেকে বীজগুলো তুলে উল্টো করে আবার বোতলে রাখতে হবে, যাতে মূল ঊর্ধ্বমুখী থাকে। রাখতে হবে আগের মতো বোতলের গাত্রদেশ এবং ব্লটিং পেপারের মাঝখানে। তা সত্ত্বেও দেখা যাবে কয়েকদিন পর মূল ঊর্ধ্বমুখী না হয়ে নিম্নমুখী হচ্ছে। বীজ থেকে যখন কাণ্ড দেখা দেবে, কাণ্ড কিন্তু সর্বদাই হবে ঊর্ধ্বমুখী এবং যে বিশেষ শক্তিতে সে ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে তার নাম, নেগেটিভ জিওট্রপিজম। কাণ্ড সর্বদাই আলোকাভিমুখী। কয়েকদিন যদি বোতলটা উল্টো করে রাখা হয় তাহলেও দেখা যাবে মূল ও কাণ্ড নিজ নিজ প্রাকৃতিক পথে যাবার জন্য দিক পরিবর্তন করছে।

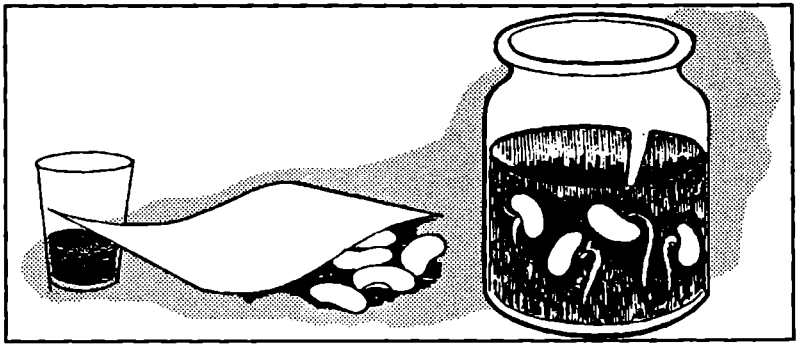

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, গাছের কাণ্ড সর্বদাই উপরের দিকে এবং মূল নিচের দিকে ধাবিত হয়।

www.pathagar.com

মূলের সব অংশের বিকাশ একই রকম হয় বা বিশেষ কোনো অংশের বিকাশ অন্য অংশের চেয়ে বেশি হয়–পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর?

উপকরণ : অঙ্কুরোদগম ধানের কয়েকটি বীজ, সীমের বীজ, চওড়া মুখের একটি জার, ব্লটিং পেপার।

কার্যপ্রণালী : উদ্ভিদের যে অংশ মাটির নিচে থাকে, তাকে বলে মূল। উদ্ভিদকে মাটিতে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে সাহায্য করা ছাড়াও গাছের শিকড় মাটি থেকে পানি ও খাদ্য আহরণ করে। শিকড়ের সর্বাংশের বিকাশ সমান হয় না। বিশেষ কোনো অংশের বিকাশ অন্য অংশের চেয়ে বেশি। নিচের পরীক্ষার মাধ্যমে তা প্রমাণ করা খুব সহজ।

প্রথমে অঙ্কুরোদগম ধানের কয়েকটি বীজ চওড়া মুখের জারের মধ্যে নিতে হবে। তার ভেতরে গোল করে ভাঁজ করে রাখতে হবে ব্লটিং পেপার। সীমের বীজগুলি রাখতে হবে জারের গাত্রদেশ এবং ব্লটিং পেপারের মাঝে। ব্লটিং পেপার অবশ্যই ভিজিতে দিতে হবে। এবার জারটি এমন এক জায়গায় রাখতে হবে যেখানে যথেষ্ট আলো ও উত্তাপ থাকে। কয়েকদিন সেখানে রাখার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ব্লটিং পেপার যেন শুকিয়ে না যায় সে জন্য মাঝে মাঝে পানি দিতে হবে।

কয়েকদিন পর বীজ থেকে শিকড় গজতে শুরু করবে। শিক যখন ২-৫ সেন্টিমিটার লম্বা হবে, তখন দু-একটি বীজ বের করে এনে মাপার স্কেল দিয়ে ৩ সেন্টিমিটার অন্তর দাগ দিতে হবে। একটি সুঁচ ও ওয়াটার প্রুফ কালি দিতে তা করতে হবে, তবে অবশ্যই সাবধান থাকবে হতে যাতে শিকড়ের ক্ষতি না হয়।

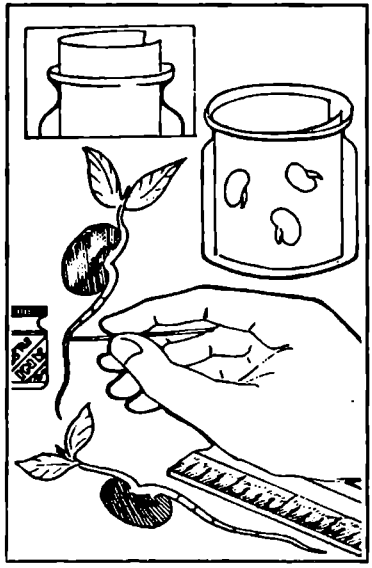

দাগ দেবার পর বীজগুলো আবার বোতলে রাখ এবং বোতলটি আবার এমন জায়গায় রাখতে হবে যেখানে দৈনিক দাগ দেওয়া অংশগুলোর বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। দেখা যাবে, শিকড়ের ডগার অংশের বৃদ্ধি সবথেকে বেশি হয়েছে, অন্যান্য অংশের তুলনায়, অর্থাৎ শিকড়ের ওই অংশের বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি।

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, মূলের সব অংশই বৃদ্ধি পায় তবে বিশেষ বিশেষ অংশ বেশি বৃদ্ধি পায়।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ৮০ গাছের শিকড় মাটি থেকে পানি শোষণ করে। কিন্তু সেই পানি উদ্ভিদের অন্যান্য অংশে কিভাবে পৌছায়?

উপকরণ : একটা ছুরি, একটা বড় গোল আলু, একটা পাত্র।

কার্যপ্রণালী : প্রথমে গোলআলু মাঝখান দিয়ে দু'টুকরো করে কাটতে হবে। একটা টুকরো ছুরির সাহায্যে ভেতরের শাঁস কিছুটা চেঁছে বাদ দিয়ে বাটির মতো করতে হবে। কাটার সময় সাবধান থাকবে হবে যেন কোনো ছিদ্র না হয়ে যায়। এবার বাটির মতো করা আলুর খণ্ডটি একটি পাত্রে রাখতে হবে। আলুর চাঁছা দিকটা যেন ওপরের দিকে থাকে। এবার আস্তে আস্তে পাত্রে পানি ঢালতে হবে এবং পানি এমনভাবে ঢালতে হবে যাতে আলু খণ্ডের দুই তৃতীয়াংশ ডুবে থাকে। আলুর গায়ে পানির মাত্রার চিহ্ন কেটে দিতে হবে। আলুর গর্তের ভেতরে ২-৩ চামচ চিনি দিয়ে কয়েক ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে।

কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে যে পাত্রে পানির মাত্রা বেশ কিছুটা কমে এসেছে। এর কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে আলুর যে সব কোষ চিনির কাছে সেগুলো চিনি আহরণ করে ঘনত্ব পাচ্ছে। ফলে, সন্নিহিত কোষগুলির পানি এইসব কোষ টেনে নিচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার নাম, "অসমোসিস্"। আশপাশের কোষগুলো আবার সন্নিহিত কোষগুলো থেকে পানি সংগ্রহ করছে এবং এভাবে রচিত হচ্ছে এক শৃঙ্খলা, যা আলুর খোসার সন্নিহিত কোষগুলো পর্যন্ত পৌছায়। এসব কোষ পানির অভাব পূরণ করে পাত্র থেকে পানি গ্রহণের মাধ্যমে এবং সেজন্যই পাত্রের পানির মাত্রা কম হতে থাকে।

এই অস্মোসিস্ প্রক্রিয়ার দ্বারা শিকড় মাটি থেকে এক মিশ্রণের আকারে খনিজ লবণ গ্রহণ করে। শিকড়ে আছে সুক্ষ্ম রোঁয়া, যার ত্বক আধা-প্রবেশ্য পর্দার মতো কাজ করে এবং শিকড়ের দিকে খনিজ লবণের তরল মিশ্রণ বহন করে নিয়ে যায়, কিন্তু ঘন হয়ে বেরিয়ে যেতে দেয় না। যে প্রক্রিয়ায় তা কাণ্ডদেশ এবং উদ্ভিদের অন্যান্য অংশ পর্যন্ত পৌছায়, তাকে বলে "ক্যাপিলারিটি"।

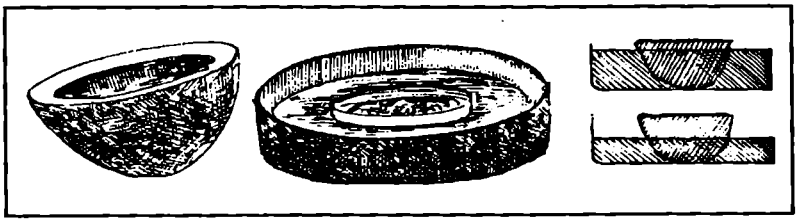

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, কিভাবে উদ্ভিদের শিকড় মাটি থেকে পানি শোষণ করে এবং কিভাবে উদ্ভিদের অন্যান্য অংশে পৌছায়।

www.pathagar.com

শিকড় মাটি থেকে পানি সংগ্রহ করে উদ্ভিদ ও গাছপালার প্রাণশক্তি যোগায়। কিন্তু তারপর সেই পানির কি হয়?

উপকরণ : টবে বসানো একটা গাছ, একটা পলিথিন শিট।

কার্যপ্রণালী : প্রথমে টবে বসানো গাছটাকে টবশুদ্ধ পলেথিনের শিট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এরপর বেশ কিছুক্ষণ টবটা রোদে রেখে দিতে হবে।

৪-৫ ঘণ্টা পর গিয়ে দেখা যাবে, পলিথিনের গায়ে শিশির বিন্দুর মতো ক্ষুদ্র পানির কণা। এই পানি কোথা থেকে এল?

দ্রুত বাড়ন্ত পাতাসমৃদ্ধ গাছ পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না। প্রতিদিন পানি দিলেও দেখা যাবে পাতাগুলোতে কেমন শুষ্কভাব। শিকড় মাটি থেকে যে পানি সংগ্রহ করে, তা কাণ্ড দিয়ে পাতা পৌঁছায়। পাতায় আছে সূক্ষ্ম গাত্ররন্ধ্র, উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে স্টোমাটা। এই সূক্ষ্ম রন্ধ্রপথ দিয়েই পানি বাষ্পীভূত হয়। পাতার এই বাষ্পীভবনকেই বলে 'ট্রান্সপায়ারেশন'। এই সমগ্র প্রক্রিয়া, অর্থাৎ মাটি থেকে শিকড়ের পানি সংগ্রহ থেকে শুরু করে পাতার মধ্য দিয়ে বাষ্পীভবন পর্যন্ত প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের প্রতিটি কোষ কখনও পানি থেকে বঞ্চিত হয় না এবং এর মধ্য দিয়ে খনিজ ও রাসায়নিক পদার্থ দ্রবীভূত হয়। ওপরের ওই পরীক্ষায় পলিথিন শিটের গায়ে যে ক্ষুদ্র পানির কণা দেখা গেছে তা পাতার বাষ্পীভবনের এক অকাট্য প্রমাণ। শিকড় মাটি থেকে যে পানি শুষে নেয়, তারই চরম পরিণতি।

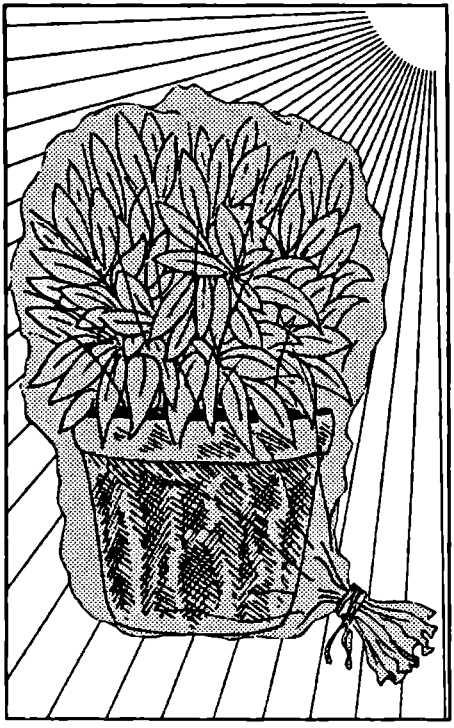

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, শিকড় মাটি থেকে পানি সংগ্রহ করে উদ্ভিদ ও গাছপালার প্রাণশক্তি যোগায় এবং পরবর্তীতে সেই পানি পাতার বাষ্পীভবনের মাধ্যমে বাতাসে মিশে যায়।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ৮২ ভূ-পৃষ্ঠের কাছে বায়ু প্রবাহের দিক নির্ণয়ের জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাকে বলে 'উইন্ড ভেইন' বা হাওয়া নিশান। কিন্তু অতি উচ্চতায় বায়ু প্রবাহের দিক নির্ণয়ের জন্য কোন যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়?

উপকরণ : ২০ সেন্টিমিটার চারকোনা একখণ্ড কার্ডবোর্ড, একটা আয়না, আঠা, নেইলপলিশ বা তরল কোনো রঙ, একটা কলম।

কার্যপ্রণালী : ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি প্রবাহিত বায়ুর দিক্ প্রকৃতি অতি উচ্চতায় প্রবাহিত বায়ুর মতো হবে–এমন কোনো কথা নেই। আবহবিদ্‌দের পক্ষে শুধু ভূ-পৃষ্ঠের নয়, অতি উচ্চতায় বায়ুর দিক নির্ধারণও বিশেষ জরুরি। অতি উচ্চতায় বায়ুর দিক নির্ণয়ে মেঘমালার সঙ্গে সঙ্গে একটি যন্ত্রের প্রয়োজন হয়, যার নাম 'নেফোস্কোপ'। এই যন্ত্রের ব্যবহারের জন্য সামান্য মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দরকার।

প্রথমে ২০ সেন্টিমিটার চারকোনা কার্ডবোর্ড নিয়ে তাতে ১৫ সেন্টিমিটার ব্যাসের একটি বৃত্ত এঁকে কার্ডবোর্ডের উপর সমব্যাসের একটা আয়না আঠা দিয়ে আটকে দিতে হবে। আয়নার ঠিক মাঝখানে একফোঁটা নেইলপলিশ বা কোনো তরল রং দিতে হবে। এবার বৃত্তের চারদিকে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, চিহ্নিত করার জন্য সংক্ষেপে উ., দ., পূ., প. লিখলেই হবে। এছাড়া ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে, সেভাবে উপ., উপূ., দপ., দপূ. দিকের কোণগুলিও চিহ্নিত করতে হবে।

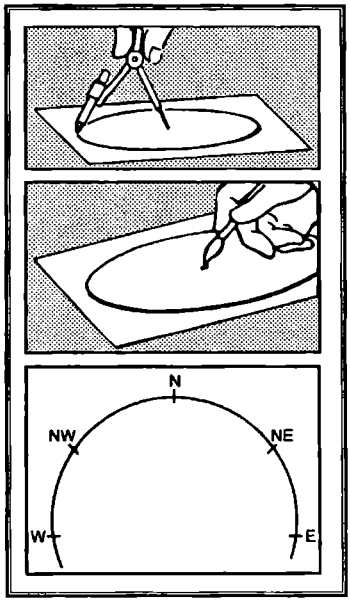

নেফোস্কোপ ব্যবহার করার সময়, সমতল কোনোকিছুর ওপর রেখে এন অর্থাৎ 'উ' দিকটা রাখতে হবে উত্তর দিকে। এবার লক্ষ্য করতে হবে, আয়নায় রঙের বিন্দুস্থানে আকাশের ভাসমান মেঘমালা এবং সেই মেঘমালার দিকে প্রবাহ অর্থাৎ যেদিক যাচ্ছে তা চিহ্নিত কর। অতি উচ্চস্থানে বায়ু সেইদিকেই প্রবাহিত হয় এবং বিপরীত দিক থেকে আসে।

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ু প্রবাহের দিক নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় 'উইন্ড ভেইন' বা হাওয়া মেশিন এবং অতি উচ্চতায় বায়ু প্রবাহের দিক নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় 'নেফোস্কোপ'।

www.pathagar.com

বায়ু কখনও একই গতিতে প্রবাহিত হয় না–কখনও জোরে কখনও ধীরে। 'অ্যানিমোমিটার' যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর গতি মাপা হয়। ঘরে বসে কিভাবে 'অ্যানিমোমিটার' তৈরি করা যায়?

উপকরণ : দুটো রাবারের বল, তরল রঙ, ৪৫ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ২ সেন্টিমিটার চওড়া দুটি কাঠের খণ্ড, আলপিন, একটা বড় পেরেক, ৬০ সেন্টিমিটার লম্বা কাঠের খণ্ড।

কার্যপ্রণালী : প্রথমে রাবারের বল দুটোকে মাঝখান দিয়ে কেটে টুকরোগুলোর ভেতরের দিকে আলাদা আলাদা রঙ লাগিয়ে দিতে হবে যাতে করে টুকরোগুলিকে সহজে চেনা যায়। এবার দুটো কাঠখণ্ডের দুদিকে টুকরো করা বলের দুটো অংশ আলপিন বা ছোট পেরেক দিয়ে আটক দিতে হবে। এরপর কাঠের একটা খণ্ড অপর খণ্ডের ওপরে ৯০ ডিগ্রি কোণ করে আড়াআড়িভাবে রেখে বড় পেরেকটা দিয়ে আটকে দিতে হবে। তবে পেরেকের মুখ যেন কাঠের খণ্ড দুটিকে গাঁথার পর উভয়দিকে কিছুটা বেরিয়ে থাকে। এবার ৬০ সেন্টিমিটার লম্বা কাঠের খণ্ডটি সোজা করে দাঁড় করিয়ে বলের অর্ধাংশ যুক্ত দুটি কাঠের টুকরো তার ওপর বসিয়ে দিতে হবে বড় পেরেকের বাড়তি অংশ দ্বারা। ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে।

এবার নিজের হাতে তৈরি অ্যানিমোমিটার বাড়ির বাইরে কোনো খোলা জায়গায় বা বাড়ির ছাদে রাখলে বাতাসের সাহায্যে তা আপন অক্ষে ঘুরতে পারবে। কিন্তু বায়ুর গতি নির্ণর করা যাবে কিভাবে? বাতাসের গতি নির্ণয় করা যাবে বলের যে কোনো একট খণ্ড ৩০ সেকেন্ডে কতবার ঘুরছে তা গণনা করতে হবে। তারপর সেই সংখ্যাকে ৩ দিয়ে ভাগ করতে হবে। উত্তর যা হবে, সেটাই হবে বায়ুর মোটামুটি গতি, প্রতি ঘণ্টায় কিলোমিটার হিসেবে। আর যদি মাইলে হিসেব করতে হয় তাহলে ৩-এর পরিবর্তে ৫ দিয়ে ভাগ করতে হবে।

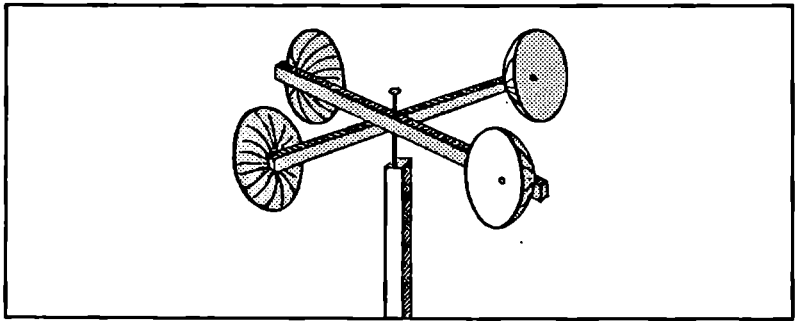

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, কিভাবে ঘরে বসেই বায়ুর গতি মাপার যন্ত্র 'অ্যানিমোমিটার' তৈরি করা যায় এবং কিভাবে বায়ুর গতি মাপা যায়।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ৮৪

বাতাস একদিক থেকে অন্যদিকে প্রবাহিত হয়। বাতাসের সঠিক দিক নির্ণয়ের জন্য যে যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয় তার নাম 'উইন্ড ভেইন' বা বায়ু নিশান। ঘরে বসে কিভাবে তা তৈরি করা যায়?

উপকরণ : কার্ডবোর্ড, একটা বড় গোছের আলপিন, একটা কাঠের রড।

কার্যপ্রণালী : প্রথমে কার্ডবোর্ড কেটে (ছবির মতো করে) তৈরি করতে হবে একটা তীর। সেই তীর আঙুলের ওপর রেখে নির্ণয় করতে হবে তার ভরকেন্দ্র বা সেন্টার অব গ্র্যাভিটি। সমান্তরাল অবস্থায় যে বিন্দুতে তীরের ভারসাম্য রক্ষিত হয়, সেটাই তার কেন্দ্রবিন্দু। সেই বিন্দুতে তীরের ঘনত্ব বা থিকনেস বরাবার একটা বড় গোছের আলপিন প্রবেশ করাতে হবে।

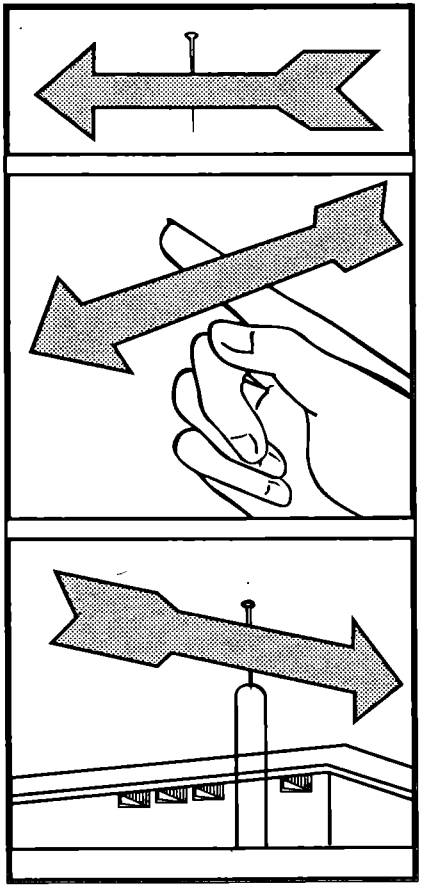

এবার কাঠের রডের মাথায় একটা ছোট ছিদ্র করতে হবে। কিন্তু ছিদ্রটি এমনভাবে করতে হবে যাতে তীরের আলপিনের পুরোটা যেন তাতে ঢুকে না যায়; কিছুটা যেন তীরের উভয়দিক থেকে বেরিয়ে থাকে, অর্থাৎ তীরের মাঝখান থেকে পিনের যতটুকু বেরিয়ে থাকবে, কাঠখণ্ডের ছিদ্রপথ যেন তা থেকে কম গভীর হয়।

এবার কাঠখণ্ডটা কোনোকিছুর সাহায্যে দাঁড় করিয়ে তার ওপরে বাসাতে হবে পিনসুদ্ধ তীরটা। এবার দেখা যাবে হাওয়া যেদিক থেকে বইবে, তীরের মুখও সেদিকে ঘুরবে। অর্থাৎ হাওয়ার দিক নির্দেশ করবে।

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, বাতাসের দিক নির্ণয়ের জন্য ঘরে বসেই 'উইন্ড ভেইন' যন্ত্র বা বায়ু নিশান যন্ত্র তৈরি করা যায় এবং সে যন্ত্রের সাহায্যে বাতাসের দিকও নির্ণয় করা যায়।

www.pathagar.com

যে যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয়, তাকে বলে হাইগ্রোমিটার। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর কিভাবে কোন যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা পরিমাপ করা যায় ?

উপকরণ : কার্ডবোর্ড, কাঠের পটুকরো, সুতো গুটানোর একটা কাটিম বা সুতোর রিল, একটা স্ট্র, একটা ব্লেড, ড্রইং পিন।

কার্যপ্রণালী : প্রথমে ছবিতে যেরকম দেখানো হয়েছে, সেরকম একটা স্ট্যান্ড তৈরি করে নিতে হবে। কাঠের টুকরো যুক্ত করে তাতে সুতো গুটানোর জন্য একটা কাটিম বা সুতোর রিল এমনভাবে বসাতে হবে যাতে রিলটা নিজ অক্ষে ঘুরতে পারে। সুতোর রিল বা কাটিমের নিচে বসাতে হবে একটা সাদা কার্ডবোর্ড। কার্ডবোর্ডে পরিমাপ চিহ্ন দিতে হবে সময়মতো।

এবার স্ট্রটার মুখ ব্লেড দিয়ে ছুঁচালো করতে হবে। এবার ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে, সেভাবে কাটিমের ঠিক নিচে কার্ডবোর্ডের মাঝখানে ড্রইং পিন্ দিয়ে স্ট্রটা আটকে দিতে হবে, তবে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, স্ট্র-এর যেখানটায় ড্রইং পিন বসানো হয়েছে, সে অংশ ড্রইং পিন ও স্ট্রয়ের ছুঁচালো মুখের অংশের চেয়ে ছোটো হবে, অর্থাৎ ড্রইং পিন থেকে ছুঁচালো মুখের দিকটা বড় হবে, যাতে ছুঁচালো মুখের দিকেই ভারটা বেশি থাকে। এও লক্ষ্য রাখতে হবে স্ট্র যেন ড্রইং পিনের দ্বারা কার্ডবোর্ডের সঙ্গে একদম আটকে না যায়, অর্থাৎ তা যেন বিনা বাধায় ওপর-নিচ করতে পারে।

এবার দরকার মানুষের মাথার একটা লম্বা চুল। চুলের একটা দিক রিলের ওপরে সেলোটেপ দিয়ে আটকে দিতে হবে এবং অপর দিকটা রিলের ওপর দিয়ে এনে স্ট্রয়ের সরু মুখের সঙ্গে বেঁধে দিতে হবে। স্ট্র যেন সমান্তরালভাবে থাকে।

এবার পরীক্ষার জন্য হাইগ্রোমিটারটি গরম পানিতে ভেজানো তোয়ালে দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। কিছুক্ষণ পর তোয়ালে সরিয়ে স্ট্রয়ের সরু মুখের অবস্থানটা নোট করতে হবে। আদ্রতার দরুণ চুলের দৈর্ঘ্য বেড়েছে, মানে আরো লম্বা হয়েছে, যার ফলে স্ট্রয়ের মুখ নিচের দিকে নেমেছে। এখন চুলের আর্দ্রভাব গরম বা শুষ্ক কোনো স্থানে রেখে দূর করতে হবে। স্ট্রয়ের মুখ যখন একই স্থানে দীর্ঘক্ষণ স্থায়ীভাবে থাকবে, সেই স্থানটাও চিহ্নিত করতে হবে। এই বিন্দুটা আগের চিহ্নের ওপরই হবে এই দুটি স্থানকে দু'ভাগে ভাগ করে ছোট ছোট দাঁড়ি দিয়ে বিভক্ত করতে হবে। এর দ্বারা বিভিন্ন দিনের বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতার পরিমাণ জানা যাবে।

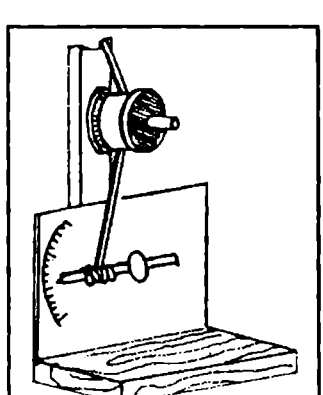

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, হাইগ্রোমিটার কিভাবে তৈরি করা যায় এবং এবং হাইগ্রোমিটারের সাহায্যে কিভাবে বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতার পরিমাপ করা যায়।

www.pathagar.com

প রী ক্ষা ৮৬

তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব মাপার জন্য হাইড্রোমিটার যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। হাইড্রোমিটার যন্ত্রটা কিভাবে তৈরি করা যায় এবং কিভাবে তা কাজ করে প্রমাণ কর ?

উপকরণ : হোমিওপ্যাথিক ওষুধের একটা শিশি, এক গ্লাস পানি, ছোট ছোট কয়েকটা পেরেক।

কার্যপ্রণালী : প্রথমে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শিশিতে কয়েকটি পেরেক রেখে গ্লাসের পানিতে ছেড়ে দিতে হবে। পেরেকগুলো ডুবছে না ভাসছে? যদি দেখা যায় ডুবছে, তাহলে প্রয়োজনমতো পেরেক তুলে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে শিশিটা শুধু পানিতে ভাসবেই না, খাড়াখাড়িভাবে ভাসবে এবং কিছুটা অংশ পানির ওপরে থাকবে। যে অংশ পানির ওপরে আছে, সেখানে কলম দিয়ে দাগ দিে হবে। এবার শিশিটা পানি থেকে তুলে নিয়ে, পানিতে মেশাতে হবে ৩-৪ চামচ চিনি। তারপর আবার শিশিটা পানিতে রাখতে হবে। এবার দেখা যাবে শিশির যে অংশটুকু আগে পানির ওপরে ছিল, এবার তা আরো বেড়েছে, অর্থাৎ পানির ওপরে থাকা শিশির অংশ বেড়েছে। এতেই প্রমাণ হয়, পানিতে চিনি মেশানোর দরুণ পানির আপেক্ষিক গুরুত্ব (স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি) বেড়েছে।

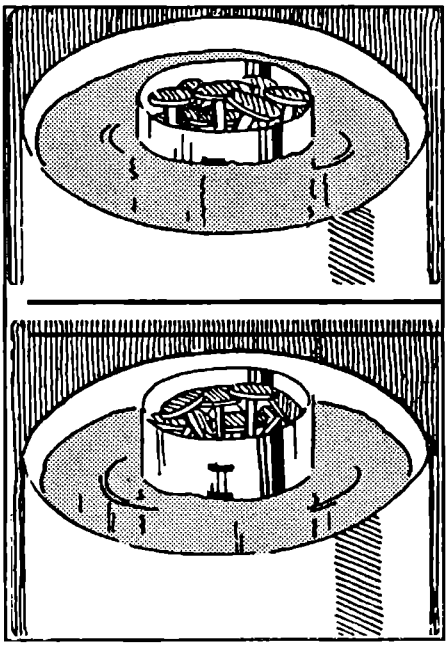

তরল পদার্থ যদি ভারী হয়, এক কথায় স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি যদি বেশি হয়, তাহলে বস্তু তার নিজ ওজনের সমান, কম পানি অপসারিত করবে। এভাবে আমরা হাইড্রোমিটারের সাহায্যে দুধ, লবণপানি ও অন্যান্য তরল পদার্থের তুলনামূলক আপেক্ষিক গুরুত্বও অনুশীলন করতে পারি।

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিমাপের জন্য হাইড্রোমিটার ব্যবহার করা হয়, এই হাইড্রোমিটার কিভাবে তৈরি করা যায় এবং কিভাবে তা কাজ করে।

www.pathagar.com

অবিরাম বৃষ্টি ঝরছে, কিন্তু শুধু বৃষ্টি দেখে বলা যাবে না, কি পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি মাপার যন্ত্রের নাম 'রেইন গেইজ' বা বৃষ্টিপাত পরিমাপক যন্ত্র। এই যন্ত্র কিভাবে তৈরি করা যায় এবং কিভাবে তা কাজ করে?

উপকরণ : দুটি বোতল (একটির মুখ ও তলা হবে চওড়া এবং অপরটির মুখ হবে চওড়া কিন্তু তলা হবে সরু) আর কিছু পানি।

কার্যপ্রণালী : প্রথমে চওড়া মুখ ও তলাযুক্ত বোতলে পানি ঢালতে হবে এবং পানির মাত্রা হবে তলা থেকে ২.৫ সেন্টিমিটার। এবর ঐ পানি রাখতে হবে চওড়া মুখ ও সরু তলার বোতলে। রাখার পর, পানির পরিমাণকে সমান ৫ ভাগে ভাগ কর। প্রতি ভাগের পরিমাণ হবে ৫ সেন্টিমিটার। প্রতিটি দাগ রঙ দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে এবং শুকোতে হবে। এটাই হবে বৃষ্টি পরিমাপক বোতল।

এবার চওড়া মুখ ও তলাযুক্ত খালি বোতলটার গলা পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। যদি সম্ভব হয় তাহলে মুখে সমান মাপের একটি ফানেল বসিয়ে দিতে হবে। না হলেও ক্ষতি নেই।

বৃষ্টি শুরু হলে, বৃষ্টির পানি ওই বোতলে জমবে। বৃষ্টি থেমে গেলে ওই বোতলে জমা পানি, সরু তলাযুক্ত বোতলে ঢালতে এবং মিলিমিটারের হিসেবে দেখতে হবে কতটা বৃষ্টির পানি জমেছে। যতটা পানি জমেছে সেটাই হবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ। এভাবে প্রতিদিন বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করে মাপতে পারলে, নিজ নিজ এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণও বলা যাবে।

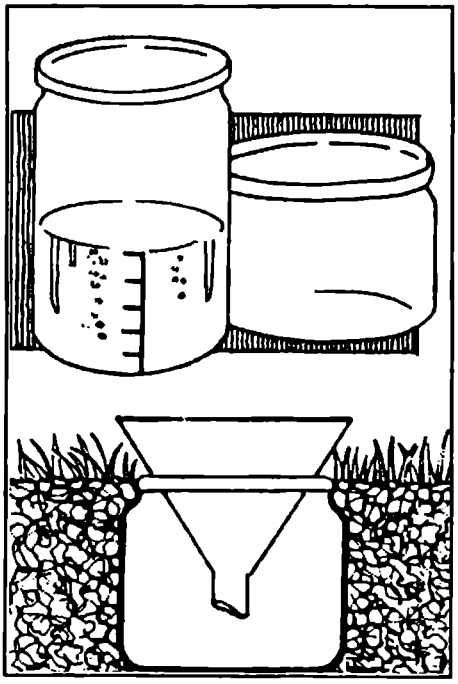

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, রেইন গেইজ তৈরি করা যায় এবং কিভাবে বৃষ্টিপাত পরিমাপ করা যায়।

www.pathagar.com

প রী ক্ষা ৮৮

টারবাইন কি এবং পানির সাহায্যে টারবাইন কিভাবে ঘোরে?

উপকরণ : একটা বড় কর্ক, সুয়েটার বোনা কাঁটা, ৬টি হোল্ডার কলমের নিব, কোট রাখার পুরোনো একটি হ্যাঙ্গার, পানির রাখার জন্য একটা টিন।

কার্যপ্রণালী : পানি প্রবাহের শক্তি প্রচণ্ড। এই প্রচণ্ড শক্তির দ্বারা বড় বড় মেশিন চালানো যায়। পানিশক্তি দ্বারা চালিত যন্ত্রের বড় বড় চাকা, যাকে টারবাইন বলে পানিবিদ্যুৎ প্রকল্পে বিদ্যুৎ উৎপাদনে এখন তা কাজে লাগানো হয়। এই টারবাইনা কিভাবে চলে? নিচের পরীক্ষার মাধ্যমে তা দেখা যাক :

প্রথমে বড় কর্কের মধ্যে সুয়েটার বোনা কাঁটা প্রবেশ করাতে হবে। ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে। এবার কর্কের চারপাশে সমান দূরত্বে বসাতে হবে ৬টি হোল্ডার কলমের নিব। নিবগুলো এমনভাবে বসাতে হবে, যাতে তা সুয়েটার বোনার কাঁটার সঙ্গে ৯০ ডিগ্রি কোণ করে থাকে।

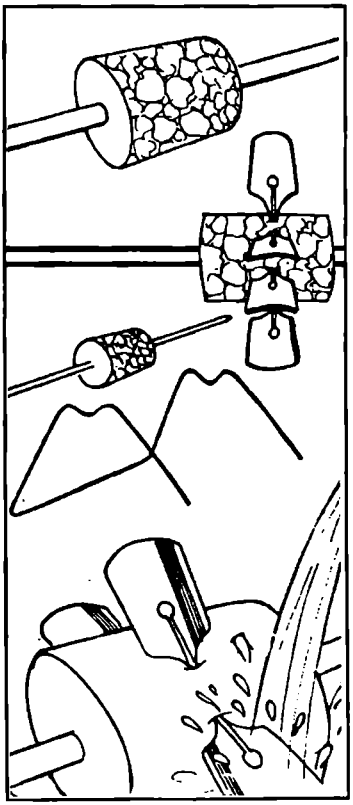

এবার কোট্ রাখার পুরোনো হ্যাঙ্গারটা ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে, সেভাবে আকার দিতে হবে। তারপর কর্কশুদ্ধ কাঁটাটা তার ওপর রেখে দেখা যাক, অবাধে তা ঘোরে কিনা। অর্থাৎ হ্যাঙ্গারটিকে সুয়েটার বোনা কাঁটা রাখার একটা স্ট্যান্ড হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। সেই স্ট্যান্ডে যদি তা ঠিকমতো ঘোরে, তাহলেই তৈরি হয়ে যাবে টারবাইন।

এবার পানি রাখার টিনটির নিচের দিকে একটা ছিদ্র করে তা এমনভাবে বসাতে হবে যেন, টিনে পানি ভর্তি করলে ওই ছিদ্র পথ দিয়ে পানির প্রবাহ যেন সরাসরি ব্লেডগুলির (এক্ষেত্রে নিবগুলো) ওপর পড়ে। এবার কি হচ্ছে? পানি প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে টারবাইন ঘুরছে। ঠিক যেভাবে আসল টারবাইন ঘোরে।

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, টারবাইন কি এবং পানির সাহায্যে টারবাইন কিভাবে কাজ করে।

www.pathagar.com

ফটোমিটার কি? ফটোমিটার কিভাবে কাজ করে?

উপকরণ : একটা কাঠের পাটাতন, সাদা কার্ডবোর্ড, দুটি পেনসিল, আর তিনটি মোমবাতি।

কার্যপ্রণালী : আলোর তীব্রতা পরিমাপের জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তার নাম ফটোমিটার। এর সাহায্যে দুটি আলোর উৎসের তুলনা করা যায়, যার একটার শক্তি আমাদের জানা আছে, অপরটির জানা নেই। নিচের পরীক্ষার মাধ্যমে তা দেখা যাক:

প্রথমে কাঠের পাটাতনে সরু করে খাঁজ কেটে তাতে খাড়াভাবে বসাতে সাদা কার্ডবোর্ডটি। খাঁজ কাটার অসুবিধা হলে সুপারগু বা আঠা জাতীয় কিছু দিয়েও কার্ডবোর্ডটি সোজাভাবে দাঁড় করানো যেতে পারে। এবার পাটাতনের ওপরে কার্ডবোর্ড থেকে ৪ সেন্টিমিটার দূরে কার্ডবোর্ডের উভয় দিকে দুটি পেন্সিল বসাতে হবে, যার ছুঁচালো দিকটা থাকবে ওপরের দিকে।

এবার একই সাইজের মোমবাতি তিনটি টেবিলের ওপর সোজাভাবে বসাতে হবে। প্রথমে তৃতীয়টি বসাতে হবে অপর দিকে–প্রথম দুটি মোমবাতি থেকে প্রায় ৬০ সেন্টিমিটার দূরত্বে। কার্ডবোর্ড ও পেন্সিলসহ কাঠের পাটাতনটি টেবিলের ওপরে মোমবাতিগুলো থেকে ঠিক সমান দূরত্বে মাঝখানে বসাতে হবে। এবার মোমবাতিগুলো জ্বালাতে হবে। কার্ডবোর্ডের ওপর দুটি ছায়া পড়বে। একটি হবে গাঢ়। এরপর পাটাতনটি ধীরে ধীরে সামনে-পেছনে করে অন্য দুটি মোমবাতি বসাতে হবে একই দিকে পাশাপাশি এবং একটা স্থানে নিয়ে, যেখান থেকে উভয়ের ছায়া হবে একই রকম। দেখা যাবে দুটি জ্বলন্ত মোমবাতি থেকে দূরত্বের পরিমাণ, একটা জ্বলন্ত মোমবাতির দূরত্বের দ্বিগুণ হয়েছে। কারণ একটা মোমবাতির উজ্জ্বলতা দুটি মোমবাতির উজ্জ্বলতার তুলনায় অর্ধেক।

যখন এই পাটাতনটি আলোর উৎস থেকে সম-দূরত্বে ছিল এবং কার্ডবোর্ডের ওপরে পড়া ছায়াও সমান ছিল, তখন মনে করতে হবে মোমবাতিগুলো একই মাত্রার আলো দিচ্ছে। এখন যদি বালবের 'ক্যান্ডেল পাওয়ার' জানতে হয় তাহলে তা অপর দিকে রাখা দুটি মোমবাতির সমান দূরত্বে রাখতে হবে। ছায়া সমান গাঢ় করার জন্য মোমবাতির সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে হবে। যখন ছায়ার গাঢ়তা সমান হবে, তখন মোমবাতির সংখ্যা গুণতে হবে এবং সেটাই হবে বালবের 'ক্যান্ডেল পাওয়ার'।

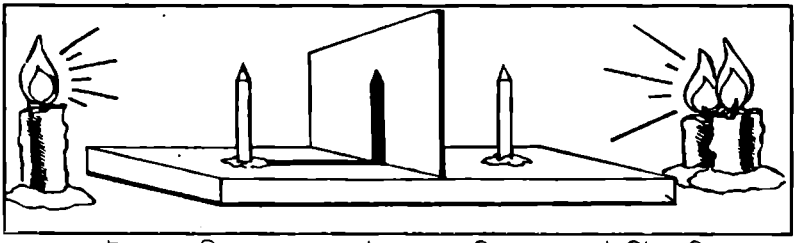

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, ফটোমিটার কি এবং তা কিভাবে কাজ করে।

www.pathagar.com

প রী ক্ষা ৯০

খালি চোখে অতি ছোট বস্তুকে বড় করে দেখায় যে যন্ত্র তার নাম অনুবীক্ষণ যন্ত্র। ঘরে বসে কিভাবে একটা ছোট অনুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করা যায়?

উপকরণ : টিনের একটা পাত (৪ সেন্টিমিটার x ১২ সেন্টিমিটার), একটা পেরেক, গ্রিস, কাঠপেন্সিল, ৮-১০টা বই, একটা কাঁচের শিট।

কার্যপ্রণালী : অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো তার লেন্স, যার মধ্য দিয়ে তাকালে ছোট জিনিসকে বড় দেখায়। কিভাবে সেই লেন্স ঘরে বসে তৈরি করা যায়, সেটাই আমাদের পরীক্ষা।

প্রথমের টিনের পাতের ঠিক মাঝখানে পেরেকের সাহায্যে ২ মিলি মিটার ছোট্ট একটা ছিদ্র করে নিতে হবে। এরপর টিনের পাতের দু'পাশ মুড়ে পিঁড়ির মতো তৈরি করতে হবে (ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে)। এবার টিনের পাতের ছিদ্র পথে গ্রিস দিয়ে দিতে হবে। এখন কাঠপেনসিল পানির ভেতর ডুবিয়ে তার সরু মুখ দিয়ে ছিদ্রের ওপর একটা ফোঁটা ফেলতে হবে। ব্যাস্ তৈরি হয়ে গেল অনুবীক্ষণ যন্ত্রের রেন্স।

এবার অল্প দূরত্বে বইগুলো দুটি সারিতে রাখতে হবে, যার উচ্চতা সমান হবে। এর ওপরে রাখতে কাঁচের একটা শিট। কাঁচের শিটের ওপরে ঠিক মাঝখানে রাখতে হবে টিনের খণ্ডটি এবং কাঁচের শিটের নিচে রাখতে হবে একটা আয়না। কোনো কিছুতে হেলান দিয়ে আয়নাটা এমনভাবে রাখতে হবে যাতে আলো পড়ে তা প্রতিফলিত হয়ে প্রথমে পড়বে কাঁচের ওপর এবং সেখান থেকে তা পানির ফোঁটা ভেদ করে যাবে। এবার পুরো অনুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি।

এখন কাঁচের ওপরে রাখতে হবে কোনো সূক্ষ্ম বস্তু, যেন শস্যকণা বা কোনো ছোট কীটপতঙ্গ আর 'পানির ফোঁটা' দিয়ে তৈরি লেন্সকে সাবধানে আগে-পিছে করে অর্থাৎ ঠিকমতো বিন্যাস্ত করে ওই বস্তুর ওপর ফোকস করতে হবে। দেখা যাবে, সেই ছোট্ট বস্তু অনেকগুণ বড় হয়ে নিজের চোখে ধরা দিয়েছে।

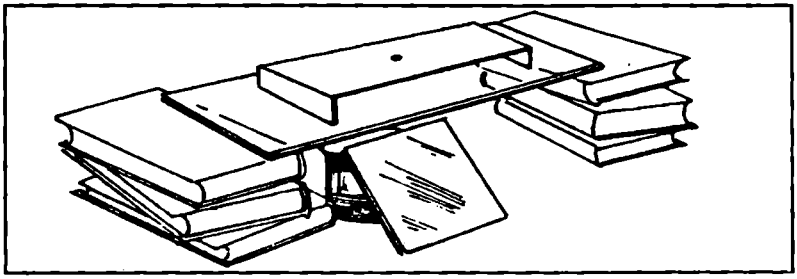

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো, ঘরে বসে কিভাবে অনুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করা যায় এবং কিভাবে তা কাজ করে।

www.pathagar.com

কোনো বাড়ি বা কোনো গাছের উচ্চতা তাতে না উঠে কিভাবে পরিমাণ করা যায়?

উপকরণ : একটা কাঠপেন্সিল আর সহকারী হিসেবে একজন বন্ধু।

কার্যপ্রণালী : এই রকম উচ্চতা পরিমাপ করা খুব সোজা। শুধু জানতে হবে নিয়মটা কি। তোমার কোনো বন্ধুকে বল, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে। তাঁর মাথার মাঝখানটা যেখানে দেয়াল স্পর্শ করেছে, সেখানে এবার একটা দাগ দিতে হবে। মাটি থেকে ওই দাগ পর্যন্ত দূরত্ব মাপতে হবে এবং সেটাই হবে তোমর বন্ধুর উচ্চতা।

এখন তোমার বন্ধুকে বল, তুমি যে বাড়ি বা গাছের উচ্চতা মাপতে চাও, তার কাছে দাঁড়াতে। তুমি দাঁড়াবে তোমার বন্ধুর থেকে প্রায় ১৫ মিটার দূরে। মনে রাখবে, তোমার কাছ থেকে বাড়ি বা গাছ, যার উচ্চতা তুমি মাপতে চাও এবং তোমার বন্ধুর দূরত্ব যেন সমান হয়। হাতে একটা পেন্সিল নিয়ে তোমার ডান হাতটা বন্ধুর দিকে এমনভাবে প্রসারিত করতে হবে, যাতে পেন্সিলের ছুঁচালো মুখ তোমার চোখের দৃষ্টি ও বন্ধুর মাথার তালুর সমরেখায় আসে। এরপর পেন্সিলের ওপর থেকে তোার বুড়ো আঙ্গুলটা নিচের দিকে নামিয়ে এনে তোমার বন্ধুর পায়ে স্থির রাখতে হবে। এর অর্থ কি? তোমার বুড়ো আঙ্গুলের ওপরে পেন্সিলের যে অংশটুকু রয়েছে সেটা তোমার বন্ধুর দেহের উচ্চতা, যা তুমিই আগেই মেপেছ।

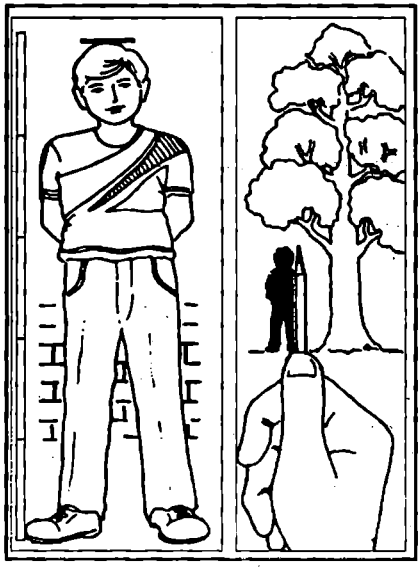

এভাবেই পেন্সিলের সাহায্যে এবার মাপা যাবে বাড়ি বা গাছের উচ্চতা। দেখতে হবে পুরো বাড়ি বা গাছটার উচ্চতা মাপার জন্য পেন্সিলের ওই পরিমাণ (বন্ধুর উচ্চতার) অংশটুকু কতবার তোমার প্রয়োগ করতে হচ্ছে। ধরা যাক, বন্ধুর উচ্চতা ১.৫ মিটার। এবং পেন্সিলের ওই অংশটুকু বাড়ির বা গাছের ক্ষেত্রে তোমায় ব্যবহার করতে হয়েছে ১২ বার, তাহলে সংশ্লিষ্ট বস্তুর উচ্চতা হবে ১.৫ X ১২ = ১৮ মিটার।

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো, কিভাবে কোনো বাড়ি বা কোনো গাছের উচ্চতা মাপা যায়।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ৯২

পানি ও বাতাসের কারণে রূপার তৈরি জিনিসপত্রের উজ্জ্বলতা কিছুদিন পর ম্লান হয়ে যায় এবং কালচে ভাব আসে। এই কালচে ভাব কিভাবে দূর করা যায়?

উপকরণ : একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাটি, বেকিং পাউডার, লবণ ও পানি।

কার্যপ্রণালী : অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে অর্ধেক পানি নিয়ে তাতে ২-৩ চামচ বেকিং পাউডার এবং সমপরিমাণ লবণ নিয়ে গরম করতে হবে। কিছুক্ষণ পর পানি ফুটতে শুরু করলে বাটিটা নামিয়ে রাখতে হবে। কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে কালচে দাগ পড়েছে। এবার রূপার জিনিসপত্র ওই মিশ্রণে মেশাতে হবে। ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে, রূপার ওইসব জিনিস যেন সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় থাকে। কিছুক্ষণ পর জিনিসগুলো তুলে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছে শুকিয়ে ফেলতে হবে। দেখা যাবে, আগের সেই কালচে দাগগুলো চলে গেছে এবং পূর্বের উজ্জ্বলতা ফিরে এসেছে।

প্রাকৃতিক অবস্থায় অধিকাংশ ধাতু যৌগিকের রূপ পাওয়া যায়, যা থেকে তাদের বিশুদ্ধতা পৃথক করা যায়। ধরা যাক, রূপা তার প্রাকৃতিক অবস্থায় যে যৌগিক অবস্থায় ছিল, তা হলো সিলভার সালফেট। সিলভার সালফেট হচ্ছে সিলভার আর সালফারের মিশ্রণ। আর সিলভার আর সালফারের মিশ্রণের ফলে রূপার ওপরে কালচে ছোপের মতো জমা হয়েছে।

রূপা থেকে সালফার পৃথক করার সব থেকে ভালো উপায় হলো, এমন কিছু ব্যবহার করা যা রূপা থেকে সালফারকে বের করে আনতে পারে। এ কারণেই অ্যালুমিনিয়াম পাত্র ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। আর রূপার সামগ্রী যাতে অ্যালুমিনিয়ামের গা স্পর্শ করে থাকে এই জন্য বলা হয়েছে যে, অ্যালুমিনিয়ামের মধ্যে এমন কিছু গুণ আছে যা সালফারকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে অর্থাৎ রূপা থেকে সালফারকে পৃথক করতে পারে।

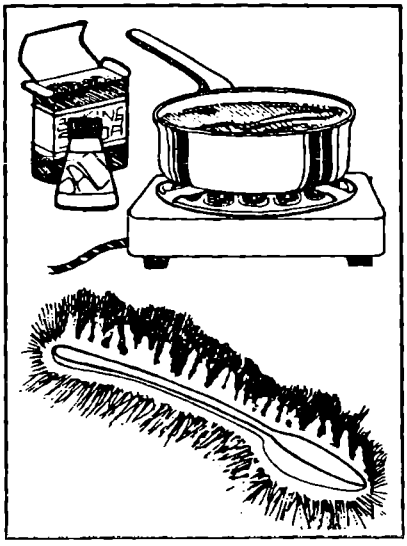

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো, কিভাবে ম্লান হয়ে যাওয়া পুরোনো রূপার জিনিসপত্র পরিষ্কার ও উজ্জ্বল করে তোলা যায়।

www.pathagar.com

স্ট্যালাক্টাইট্‌স্ এবং স্ট্যালাগ্‌মাইট্‌স্ কি?

উপকরণ : ঢাকনা ছাড়া একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স, দুটো কাঁচের গ্লাস, কিছু মোটা সুতো, দুটো পেরেক।

কার্যপ্রণালী : স্ট্যালাক্টাইট্‌স্ এবং স্ট্যালাগ্‌মাইট্‌স্ কি তা বোঝার জন্য একটা ছোট পরীক্ষা করতে হবে। প্রথমে ঢাকনা ছাড়া কার্ডবোর্ডের বাক্সের দু'পাশে কাঁচের গ্লাস দুটো রাখতে হবে। গ্লাসের লেভেল থেকে কার্ডবোর্ডের বাক্সটার লেভেল যেন নিচু হয়। এবার মোটা সুতোর দু'প্রান্তে একটা করে পেরেক বেঁধে দিয়ে সুতোটা দু'দিকের গ্লাসের ভেতর রেখে দিতে হবে। পেরেক দুটো যেন গ্লাসের নিচ পর্যন্ত স্পর্শ করে এবং সুতোটা কার্ডবোর্ডের ওপর দিয়ে যেতে পারে এতটা যেন লম্বা হয়।

এখন তৈরি করতে হবে এপ্‌স্যাম্ সল্টের (ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর যৌগিক বিশেষ) স্যাচুরেটেড্ সলিউশন, অর্থাৎ পানিতে যতটা পরিমাণ সল্ট গলে যেতে পারে। সেই স্যাচুরেটেড সলিউশন উভয় গ্লাসে ভর্তি করতে হবে। পেরেক বাঁধা সুতোর একটা দিক একটা গ্লাসে ডুবিয়ে কার্ডবোর্ডের বাক্সের ওপর দিয়ে নিয়ে অন্য দিকটা নিয়ে অপর গ্লাসে ডুবিয়ে রাখতে হবে। কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে, গ্লাসের মিশ্রণ উভয় দিক থেকে ধীরে ধীরে সুতো বেয়ে উঠছে এবং মাঝখানে ফোঁটা আকারে জমা হয়ে নিচের দিকে চূড়ার মতো আকার নিচ্ছে। একটাকেই বলে স্ট্যালাক্টাইটস্।

আর জমা হওয়া বিন্দুগুলো দেখা যাবে জমতে জমতে মাটিতে ফোঁটায় ফোঁটায় পড়তে শুরু করেছে (এক্ষেত্রে কার্ডবোর্ড বাক্সের ভেতরে) এবং সেখানে জমতে জমতে ওপর দিকে উঁচু হয়ে উঠছে। প্রক্রিয়াটা আসলে কিন্তু ওই স্ট্যালাক্টাইট্‌সের অনুরূপ। তফাৎ শুধু নিচ থেকে ওপরে উঠছে। মিশ্রণের এই যে ওপরের দিকে ওঠা এবং ফোঁটায় ফোঁটায় নিচে পড়া চলতেই থাকবে। তারপর এক সময় পানিটা হাওয়ায় মিশে যাবে। রয়ে যাবে শুধুমাত্র সল্ট। এভাবে প্রকৃতিতেও স্ট্যালাক্টাইট্‌স্ ও স্ট্যালাগ্‌মাইট্‌স্ তৈরি হয়।

চূনাপাথর এলাকার গুহাতে প্রকৃতির এই অপূর্ব সৃষ্টি দেখা যায়। আসলে সেগুলো গুহার ছাদ থেকে চুঁইয়ে পড়া ক্যালসিয়ামযুক্ত পানি ক্রমাগত জমতে জমতে এই আকার ধারণ করেছে। অর্থাৎ পানি বাষ্প হয়ে বাতাসে মিশে গেছে শুধু স্ট্যালাক্টাইট্‌স্ ও স্ট্যালাগ্‌মাইট্‌স্ রয়ে গেছে।

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্ট্যালাক্টাইট্‌স্ এবং স্ট্যালাগ্‌মাইট্‌স্ কি এবং কিভাবে তৈরি হয় তা প্রমাণ করা গেল।

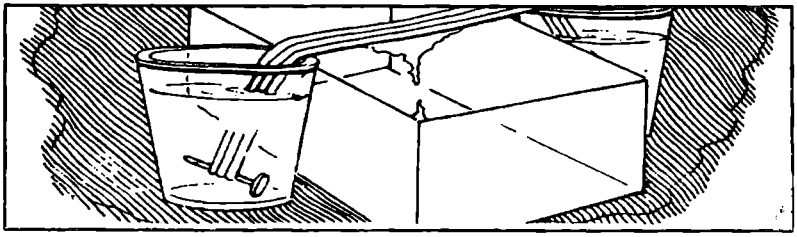

www.pathagar.com

প রী ক্ষা ৯৪

আঙুলের ছাপ অপরাধীদের ধরতে কিভাবে সাহায্য করে?

উপকরণ : এক টুকরো কাগজ, 2B বা 3B নরম পেন্সিল, ৫-৬ সেন্টিমিটার সাদা কসটেপ।

কার্যপ্রণালী : আঙুলের ডগার ত্বকে অনেক খাঁজ থাকে। হাত দিয়ে কোনোকিছু ভালো করে ধরার জন্য এই খাঁজের সৃষ্টি, অর্থাৎ ধরার সময় জিনিস যাতে পিছলে না যায়। তবে আঙুলের ছাপ কিভাবে অপরাধীদের ধরতে সাহায্য করে তা নিচের পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করা যায়।

প্রথমে, এক টুকরো কাগজকে 2B বা 3B নরম পেন্সিলের শিষ্ দিয়ে কালো করতে হবে। তারপর কোনো একটা আঙুলের ডগা তাতে ঘষে ঘষে কালো করতে হবে। দরকার হলে, ওই পেন্সিলের শীষ দিয়ে কাগজটা আবার কালো করে আঙুলটা ঘষে যেতে হবে, যাতে আঙুলের ডগায় বেশ একটা কালো স্তর পড়ে।

এবার সাদা কসটেপের আঠাওয়ালাদিকে সাবধানে আঙুলের কালো ডগার ছাপ লাগাতে হবে। আঙুল সরালে দেখা যাবে আঠাওয়ালা টেপের ওপর আঙুলের ছাপ স্পষ্ট হয়ে আছে। সাদা কাগজে টেপের এই দিকটা আটকে রাখলে আঙুলের ছাপ সুরক্ষিত অবস্থায় থাকবে। এভাবে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের আঙুলের ছাপও ধরে রাখা যায়। তবে প্রত্যেক ছাপের নিচে যার আঙুলের ছাপ, তার নাম লিখে রাখতে হবে।

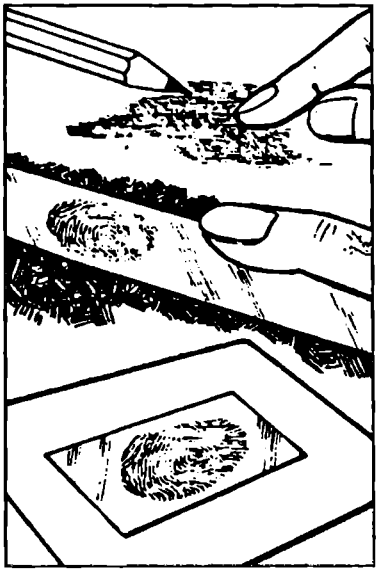

এবার ম্যাগইনফাইং গ্লাস দিয়ে আঙুলের ছাপ আলাদা আলাদা করা যায়। মনে রাখতে দুই ব্যক্তির আঙুলের চাপ কখনো এক হয় না। সেজন্য অপরাধস্থলে অপরাধীর আঙুলের ছাপ পুলিশের কাছে এক মস্ত বড় সূত্র। অপরাধস্থলে পাওয়া আঙুলের ছাপ পুলিশের কাছে রাখা দাগী বা অন্য অপরাধীদের আঙুলের ছাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে অনেক সময় অপরাধীদের সনাক্ত করা সম্ভব হয়।

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, কিভাবে আঙুলের ছাপ সংরক্ষণ করা যায় এবং কিভাবে আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করে অপরাধীদের ধরা যায়?

www.pathagar.com

পৃথিবীতে বসে পৃথিবী থেকে মহাকাশের বিভিন্ন বস্তুর দূরত্ব নিখুঁতভাবে পরিমাপ সম্ভব। কিভাবে সম্ভব?

উপকরণ : ৩ মিটার লম্বা সুতো, একজন সাহায্যকারী, পানীয়ের স্ট্র।

কার্যপ্রণালী : একটা বড় ঘরে এই পরীক্ষাটা চালাতে হবে। যেমন, ঘরের মেঝে অতিক্রম না করে কিভাবে মাপা যাবে? প্রথমে ৩ মিটার লম্বা সুতো নিয়ে সাহায্যকারী বন্ধুকে ঘরের প্রস্থ বরাবর দেয়াল থেকে অর্ধ মিটার দূরে সুতোর দু'দিক টান্-টান্ করে ধরার জন্য বলতে হবে। এখন সুতোর বাঁদিকে পানীয় স্ট্রয়ের একটা দিক এবং অন্যদিকটা বিপরীত দেওয়ালের দিকে রেখে, স্ট্রয়ের মধ্য দিয়ে কোনো একটা পয়েন্ট বা চিহ্ন লক্ষ্য করতে হবে।

এখন সাহায্যকারী বন্ধুকে বল, ১ মিটার x .২৫ মিটার আয়তনের এক টুকরো মোটা সাদা কাগজ নিয়ে স্ট্রয়ের ঠিক নিচে এমনভাবে রাখতে যাতে কাগজের ছোট দিকটা সুতো স্পর্শ করে থাকে এবং এর বাঁদিকটা যেন থাকে স্ট্র ও কাগজের টুকরো যেখানে মিলিত হয়েছে সেখানে। এখন কাগজের টুকরোর ওপর স্ট্র বরাবর একটা রেখা টানতে হবে। এরপর স্প্রকে সুতোর ডানদিকে রেখে, আগের মতো করে এবং সেই অবস্থায় স্ট্রয়ের মধ্য দিয়ে দেখা একই পয়েন্ট বা চিহ্নকে এবং এই প্রক্রিয়া পুনর্বার করতে হবে। এই সময় কাগজের ওপর আঁকা একটা লাইন পাওয়া যাবে এবং ডান কোণে তা মিলিত হচ্ছে। এখন স্কেল দিয়ে এই লাইনগুলো আরো সম্প্রসারিত করতে হবে যাতে তারা মিলিত হতে পারে এবং দৈর্ঘ্য মাপা যায়। যা হবে, তাকে ১২ দিয়ে গুণ করতে হবে। এখন মেঝে অতিক্রম না করেই রুমের দৈর্ঘ্য পাওয়া যাবে। এবার পা দিয়ে মেপে প্রকৃত পরিমাপ যাঁচাই করে নেয়া যাবে। যদি পরিমাপে কোনো পার্থক্য দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে, কোথাও ভুল হয়েছে। এভাবেই মহাকাশের বিভিন্ন বস্তুর দূরত্ব নিখুঁতভাবে পরিমাপ করা সম্ভব।

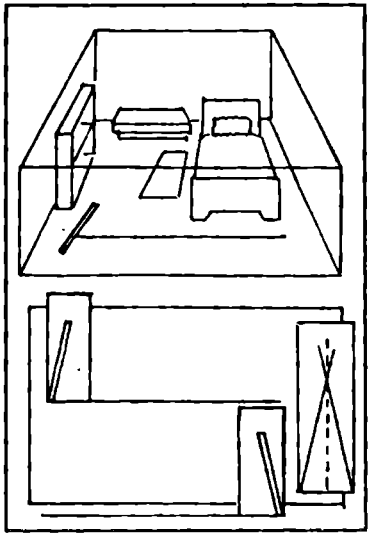

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, পৃথিবীতে বসে পৃথিবী থেকে মহকাশের বিভিন্ন বস্তুর দূরত্ব নিখুঁতভাবে পরিমাপ করা সম্ভব।

www.pathagar.com

প রী ক্ষা ৯৬

চাঁদ বা মহাকাশের অন্যান্য বস্তুর তাপমাত্রা কিভাবে নির্ণয় করা যায়?

উপকরণ : একটা থার্মোমিটার (যাতে পারদের পরিবর্তে থাকবে রঙিন পানি), একটা বালব্ ও ম্যাগনিফাইং গ্লাস।

কার্যপ্রণালী : কোনো বস্তুর তাপমাত্রা নির্ণয় করতে আমরা ব্যবহার করি থার্মোমিটার। এটা সম্ভব সেসব বস্তুর ক্ষেত্রে যা আমাদের নাগালের মধ্যে। তবে বিজ্ঞানীরা কিন্তু পৃথিবীতে বসেই দূর মহাকাশের বিভিন্ন বস্তুর তাপমাত্রা নির্ণয় করে থাকেন। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব?

এ জন্য প্রথমে রঙিন পানির থার্মোমিটার নিয়ে ঘরে জ্বালানো বাল্ব থেকে সামান্য দূরে রেখে সঙ্গে সঙ্গে তার তাপমাত্রা টুকে নিতে হবে। দু'মিনিট পর আবার তাপমাত্রা নিতে হবে। দেখা যাবে উভয় সময় নেওয়া তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, যাতে প্রমাণ হচ্ছে যে আলোর উত্তাপেই থার্মোমিটারের তাপমাত্রায় তারতম্য ঘটেছে।

এখন বালএবর আলো ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে, একই কেন্দ্রভিমুখী করে থার্মোমিটারটি এমনভাবে ধরতে হবে যাতে সমকেন্দ্রাভিমুখী আলো সোজা থার্মোমিটারের বালবের ওপরে পড়ে। লম্বা করে ধরলে দেখা যাবে তাপমাত্রা উঠছে। আসলে যা হচ্ছে, তাহলো বালবের আলোকরশ্মি লেন্সের সাহায্যে, ঘুরিয়ে একই মানে মিলিয়ে দেওয়া হয়, যাকে ফোকাস বলা হয়।

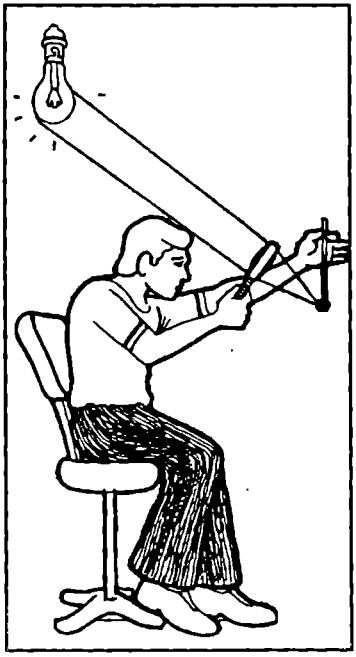

বিজ্ঞানীরা এই পদ্ধতিতেই মহাকাশের বিভিন্ন বস্তুর তাপমাত্রা পরিমাপ করে থাকেন। তবে পার্থক্য হলো, তাঁদের জানতে হয়, বস্তুর ও লেন্সের আয়তন, লেন্স ও বস্তুর মাঝের দূরত্ব এবং রেকর্ড করা দুই তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য। অবশিষ্ট যা কিছু তা খুবই সোজা। শুধু গণনা করেই তাঁরা বলে দিতে পারেন।

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, চাঁদ বা মহাকাশের অন্যান্য বস্তুর তাপমাত্রা আমরা কিভাবে নির্ণয় করতে পারি।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ৯৭

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মহাকাশে বিভিন্ন বস্তুর উত্তাপ পরিমাপের এক নিজস্ব পদ্ধতি আছে। কি সেই পদ্ধতি?

উপকরণ : একটা সাঁড়াশি, আগুনের শিখা ও একটা পেরেক।

কার্যপ্রণালী : আমরা কি গ্রহ ও নক্ষত্রের তফাৎ জানি? নক্ষত্রের নিজস্ব আলো আছে, কিন্তু গ্রহের নিজস্ব আলো নেই। গ্রহ নক্ষত্রের কাছ থেকে আলো পেলে তা প্রতিফলিত করে মাত্র। জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ মহাকাশের বিভিন্ন বস্তুর উত্তাপ পরিমাপের যে পদ্ধতি প্রয়োগ করেন, তা শুধু নক্ষত্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং সেই নক্ষত্র হবে অত্যন্ত উত্তপ্ত।

নিচের পরীক্ষার মাধ্যমে তা প্রমাণ করা যায়। সাঁড়াশি দিয়ে একটা পেরেক ধরে গনগনে আগুনের শিখার ওপর রেখে খুব ভালোভাবে গরম করে সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে তার রঙে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে কিনা। নিশ্চয় চোখে পড়বে উত্তাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে পেরেকের রঙও পরিবর্তিত হয়েছে। ফ্যাকাশে লাল রঙ হয়েছে উজ্জ্বল লাল রঙ এবং তারপর হলুদ এবং তারপর কমলা রঙ। আগুনের শিখা যদি খুব তীব্র হয়, তাহলে পেকের হলদেটে ভাব হবে সাদা এবং তারপর নীলচে সাদা। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে দূর মহাকাশের নক্ষত্র থেকে নির্গত বা বিচ্ছুরিত রঙ খুব নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করেন। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, যেসব নক্ষত্র হলুদ বর্ণের সেইসব নক্ষত্র লালবর্ণের নক্ষত্রের চেয়ে বেশি গরম। আর যেসব নক্ষত্রের বর্ণ নীলচে সেইসব নক্ষত্র এমনকি হলুদ বর্ণের চেয়েও বেশি উত্তপ্ত।

আমরা সবাই সূর্যকে খুবই উত্তপ্ত বলে মনে করি। কিন্তু আসলে এটা একটা হলুদ বর্ণের নক্ষত্র। অনুরূপ আরেকটা হলুদ বর্ণের নক্ষত্র হলো কাপেলা। আন্তারেস ও আর্কতুরাস হলো লাল বর্ণের এবং সিরিয়াস, রিগেল ও ভেগা হলো নীলচে বর্ণের।

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কিভাবে মহাকাশের বিভিন্ন বস্তুর উত্তাপ পরিমাপ করেন।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ৯৮

এমন কি হতে পারে আমরা যা খাচ্ছি তার স্বাদ জিহ্বা পুরোপুরি বুঝতে পারছে না?

উপকরণ : একটা নাশপাতি ও একটা আপেল, একটা ছুরি, ফল কেটে রাখার পাত্র এবং সাহায্যকারী বন্ধু।

কার্যপ্রণালী : আপাতদৃষ্টিতে এটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে না। কারণ যেটা খাচ্ছি সেটার স্বাদ অন্যরকম কি করে মনে হতে পারে? কিন্তু পারে। নিচের পরীক্ষার মাধ্যমে তা প্রমাণ করা যায়।

একটা আপেল আর একটা নাশপাতি নিয়ে খুব পাতলা করে কাটতে হবে। এখন তোমার বন্ধুর চোখ বেঁধে দাও। ফলের বিষয়ে তাকে অবশ্যই কিছু জানাতে দেয়া যাবে না। এখন এক টুকরো আপেল এবং এক টুকরো নাশপাতি একই সঙ্গে নিয়ে আপেলের টুকরোটা বন্ধুর মুখে দিতে হবে এবং নাশপাতির টুকরোটা ঠিক তার নাকের নিচে রাখতে হবে। সতর্ক থাকবে যে নাশপাতির টুকরোটা যেন নাক স্পর্শ না করে। বন্ধুকে এখন জিজ্ঞাসা করতে হবে সে কি খাচ্ছে। সে আপেলের পরিবর্তে বলবে নাশপাতি।

আসলে, আমাদের নাকের অবস্থান মুখের ঠিক ওপরে এমন একটা স্থানে যে, আমাদের খাওয়ার আনন্দ নির্ভর করে আমাদের নাক যে গন্ধ পায়, তার ওপর। নাক ছাড়া আমরা খাওয়ার আনন্দ পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারি না। নিশ্চয় সবাই আমরা লক্ষ্য করেছি, ঠাণ্ডা বা সর্দি হলে আমাদের নাক বন্ধ থাকে, তখন আমরা খাদ্যের পুরোপুরি স্বাদ পাই না। যাই হোক, আমরা খাওয়ার স্বাদ ও মজা পায় এ জন্য যে, নাক তার সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করে।

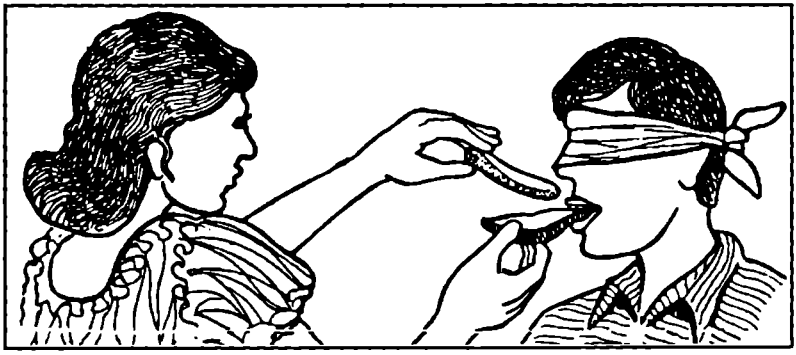

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, আমরা যা খাই তার স্বাদ জিহ্বা পুরোপুরি বুঝতে পারে না।

www.pathagar.com

মানুষের ত্বকের স্পর্শকাতারতা তাকে ধোকা দেয়। এটা কিভাবে সম্ভব?

উপকরণ : দুটো কাঠ পেন্সিল ও একজন সাহায্যকারী বন্ধু।

কার্যপ্রণালী : আমাদের দেহের কোনো অংশে যখনই কোনোকিছু স্পর্শ করে সঙ্গে সঙ্গে আমরা তা বুঝতে পারি। কিন্তু না দেখেও কি করে তা সম্ভব হয়? হ্যাঁ, সারা দেহে ত্বকের ঠিক নিচে আছে স্নায়ুতন্ত্র। বিভিন্ন স্নায়ু বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় সক্রিয়। কিন্তু এই স্নায়ুতন্ত্র সারা শরীরে সমানভাবে ছড়ানো নয়। নিচের পরীক্ষার মাধ্যমে তা বোঝা যাবে।

নিজের চোখ বেঁধে কোনো বন্ধুকে বল পেন্সিলের সরু শিষ দিয়ে তোমার হাতের তালুতে আস্তে করে ফোটাতে। তাকে বল আরেকটি পেন্সিল নিতে এবং দুটি পেন্সিলকে একত্রে নিয়ে দুটি শিষ দিয়েই তালুতে ফোটাতে। দুটি পেন্সিলের শিষের মধ্যে ৫ মিলিমিটার ব্যবধান থাকবে। হাতের তালুর বিভিন্ন স্থানে ফোটাতে বল–কখনও একটি পেন্সিলের শিষ দিয়ে কখনও দুটি পেন্সিলের শিষ দিয়ে। চোখা বাঁধা অবস্থায় প্রত্যেকবার উত্তর দেয়ার চেষ্টা কর, সে একটি পেন্সিল ব্যবহার করছে না দুটি। কতবার তোমার উত্তর সঠিক হচ্ছে লিখে রাখ।

এখন এই স্পর্শ তুমি অনুভব কর ঘাড়ের পেছন থেকে। তোমার বন্ধুকে ওই কাজ একইভাবে করতে বল ঘাড়ের পেছনে এবং দেখ কতবার তোমার উত্তর নির্ভুল হয়। আশ্চর্য্যের ব্যাপার এবার তোমার বেশির ভাগ উত্তর ভুল হবে। হতে বাধ্য। হাতের তালুতে যতগুলো নার্ভ আছে, ঘাড়ে ততগুলো নেই। এই নার্ভগুলোই কোনো কিছু ফোটানোর অনুভূতিকে মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয়। সেজন্যই কখনও কখনও অনুভূতির তারতম্য হয়। দেহের অন্যান্য অংশেও এভাবে পরীক্ষা চালানো যেতে পারে।

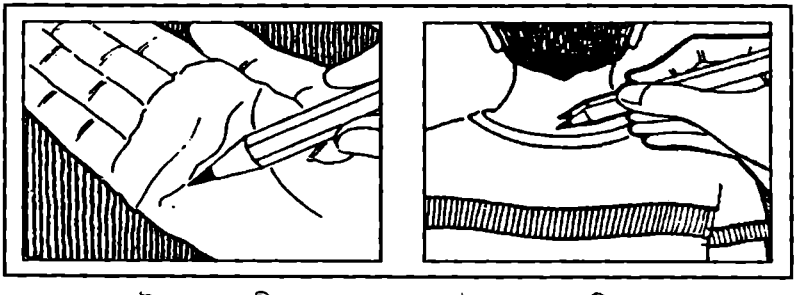

ফলাফল : উপরের পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, ত্বকের স্পর্শকাতরতাও বিভিন্ন স্থানে মাঝে মাঝে নিজেকেই ধোকা দেয়।

www.pathagar.com

প রী ক্ষা ১০০

মানুষের চোখে অনেক সময় ধাঁধা লাগে। এই ধাঁধা লাগাটা কি?

কার্যপ্রণালী : অনেক সময় এমন হয়, কোনো একটা জিনিস আসলে যেরকম, আমরা তা সেরকম দেখি না। এই ধরনের অবস্থাকে বলে চোখে ধাঁধা লাগা। এর নানা কারণ হতে পারে। এমনও হয় যে, আমাদের চোখ কোনো বস্তু বা দৃশ্য সঠিকভাবে দেখতে না পেরে ভুল বর্ণনা মস্তিষ্কে পাঠায়, যা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। কখনও কখনও আবার চোখ যে বর্ণনা পাঠায়, তাকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব না দিয়ে মস্তিষ্ক তার একটা ভুল ছবি উপস্থাপন করে।

চোখে ধাঁধা লাগার এমনি কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হচ্ছে। পরীক্ষা করলে দেখা যাবে–চোখে ধাঁধা লাগবেই। মানুষের চোখে ধাঁধা লাগা আসলে মনের ভুল। অনেকক্ষণ একই রকম দুটো বস্তু দেখলে চোখে ধাঁধা লাগে।

এই নক্সাটি কি চারপাশে ঘুরছে?

টুপির দৈর্ঘ্য বড় না প্রস্থ?

দুটি মানুষের মুখ না বাতিদান?

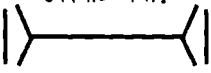

দুটি লাইনের মধ্যে কোনটি লম্বা?

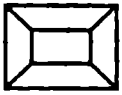

দুটির মধ্যে কোনটির আয়তন বড়?

সাদা অংশ বর্গের ওপরের দিকে না নিচের দিকে?

দুটি বৃত্তের মধ্যে কোন সাদা বৃত্তটি বড়?

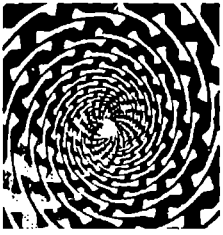

সমস্ত বৃত্তগুলো সম্পূর্ণ। কিন্তু দেখে তা মনে হচ্ছে না।

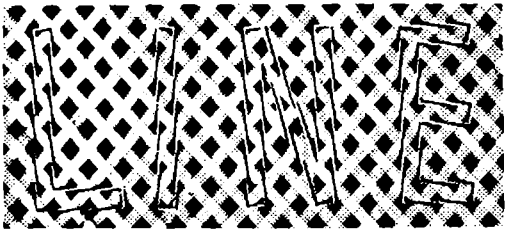

ওপরের অক্ষরগুলোকে কি বাঁকা মনে হচ্ছে না?

www.pathagar.com